এপ্রিল '84

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

ফ্যান্টাসী ও মজার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা
পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮১ পৃঃ ৯৫ দাম ৮·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ ঘনাদার জুড়ি নেই
ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৮১ পৃঃ ৯৬ দাম ৮·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ চারমূর্তি
৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮২ পৃঃ ৯২ দাম ৮·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ঝাউবাংলোর রহস্য
নতুন সংস্করণ, ১৯৭৯ পৃঃ ৭০ দাম ৮·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ কম্বল নিরুদ্দেশ
১ম সংস্করণ, ১৯৮০ পৃঃ ৭৬ দাম ৬·০০

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ॥ গুপী গাইন বাঘা বাইন
২য় সংস্করণ, ১৯৮১ পৃঃ ৪৭ দাম ৫·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ হাতিচোর
২য় সংস্করণ, ১৯৮৩ পৃঃ ৯৬ দাম ৮·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
১ম সংস্করণ, ১৯৮০ পৃঃ ১১২ দাম ৮·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ রামধনু
১ম সংস্করণ, ১৯৮২ পৃঃ ১০৮ দাম ১০·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ছোটদের মজার গল্প
নতুন সংস্করণ, ১৯৮২ পৃঃ ৯২ দাম ৬·০০

কিশোর ক্ল্যাসিক্স্

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ তেপান্তর
১ম সংস্করণ, ১৯৮০ পৃঃ ২৫২ দাম ২০·০০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ ছোটদের কাশীনাথ
১ম সংস্করণ, ১৯৭৯ পৃঃ ৯৯ দাম ৮·০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কিশোর অপু
১ম সংস্করণ, ১৯৭৯ পৃঃ ৩২৮ দাম ২০·০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ অপুর ছেলেবেলা
১ম সংস্করণ, ১৯৭৯ পৃঃ ১১৬ দাম ১০·০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ছোটদের অপরাজিত
২য় সংস্করণ, ১৯৭৯ পৃঃ ৯৫ দাম ১০·০০

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ছোটদের কাজল
২য় সংস্করণ, ১৯৭৯ পৃঃ ১০৪ দাম ১০·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ছোটদের সন্দীপন পাঠশালা
১ম সংস্করণ, ১৯৮১ পৃঃ ১০৬ দাম ৮·০০

বুদ্ধদেব বসু ॥ অপরূপ রূপকথা
নতুন সংস্করণ, ১৯৮১ পৃঃ ১৪৮ দাম ১০·০০

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ বাংলার ডাকাত ১-৪
নতুন সংস্করণ, ১৯৮১-৮২ পৃঃ ৪২৮ দাম ৩২·০০ সেট্

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ মহিম ডাকাত
নতুন সংস্করণ, ১৯৭৯ পৃঃ ১২৭ দাম ১০·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ ঘনাদা বিচিত্রা
১ম সংস্করণ, ১৯৮১ পৃঃ ২১৪ দাম ২০·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ টেনিদার অভিযান
২য় সংস্করণ, ১৯৮০ পৃঃ ২৩৮ দাম ২০·০০

শৈব্যা প্রকাশন
৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

3য় বর্ষ 12ম সংখ্যা

এপ্রিল 1984

প্রধান সম্পাদক : সমরজিৎ কর

সম্পাদক : রবীন বল

সহঃ সম্পাদক : জয়ন্ত দত্ত

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের এটি বছরপূর্তি সংখ্যা। তিন পেরিয়ে চারে পড়ছে মে' 84 তে। এই তিন বছরে তোমাদের হাতে কি কি দিতে পেরেছি আর কি কি দিতে পারিনি, তার হিসেব নিকেষ নিশ্চয় করবে। কিন্তু নতুন বছরের শুরুতে তোমরা আর কি কি পেলে সবচেয়ে বেশী খুশী হয়ে উঠবে—চট্‌পট্‌ জানাও। সাথে সাথে আমরাও ভাবতে শুরু করেছি। মে থেকে প্রতি সংখ্যায়থাকছে একটি করে অনুবাদ গল্প। বুদ্ধির পরীক্ষা, কেমন করে হয় ও আরও মজার মজার সব বিভাগ শুরু হচ্ছে।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা বসেছো, আশাকরি নির্বিঘ্নে দিয়েছো—সবার সাফল্য কামনা করি। রচনা প্রতিযোগিতার বিষয় ঘোষণা করা হয়েছে। চট্‌পট্‌ লিখে ফেল। এই মাসের শেষ পর্যন্ত জমা দেওয়া যাবে।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় 1
চিঠিপত্র 2

দপ্তর থেকে

নক্ষত্রের জন্ম ও মৃত্যু ॥ সমরজিৎ কর 5

পড়াশোনা

পদার্থবিদ্যা ॥ অলক চক্রবর্তী 27
পরমাণুর গোপন কথা ॥ সুদীপ কুমার রায় 9

ছবিতে গল্প

বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র ॥ দিলীপ দাস 17
খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 18, 19
হাবুলের বিজ্ঞান ভাবনা ॥ ধীরেন বল 20
জুলে ভার্নের টোয়েন্টী থাউজেণ্ড লীগ্‌স আণ্ডার দি সী ॥ গৌতম কর্মকার 45, 46, 57, 48
কলকাতা 2000 ॥ উজ্জ্বল ধর 28
প্রাণী বিচিত্রা ॥ শৈল চক্রবর্তী 32

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

ঘূর্ণীঝড় ॥ চিত্তরঞ্জন ঘোষাল 37

আবিষ্কারের গল্প

সাইকেল ॥ দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়

পশু পাখি উদ্ভিদ

সাদামাথা সাকি ॥ রাধারমণ রায় 36
অদ্ভুত পাখি ॥ মানস কুণ্ডু 16
পরিচিত গাছ আকন্দ ॥ গোপাল চন্দ্র দাস 43

উপন্যাস

সবুজ বনের গান ॥ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 11

শরীর স্বাস্থ্য চিকিৎসা

মানবদেহ ॥ সুবীর কুমার দাস 25

ছড়া

রোবোটের পাঠশালা ॥ শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায় 15

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা

গ্রীষ্মের তারামণ্ডল ॥ বিমান বসু 21

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র সংবাদ ॥ বরুণ মজুমদার 8
গৃহ নির্মাণের উপাদান সিমেন্ট ॥ অমরনাথ রায় 29
এ মনিহার ॥ ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় 33
বালি ॥ মনীন্দ্রনাথ রায় 40
মজার ম্যাজিক স্কোয়ার ॥ দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 41
বিজ্ঞান সংবাদ 2

ছোটদের দপ্তর

নলেজ কুইজের উত্তরদাতাদের নাম 49
নলেজ কুইজ : গত সংখ্যার সমাধান 50
প্রশ্নোত্তর ॥ সুনির্মল রায় 51
ময়লা আবর্জনাও ফেললা নয় ॥ বিপ্লব সরকার 52
গত সংখ্যার সংখ্যাকূটের সমাধান 51
ভেবে ভেবে বল ॥ ননীগোপাল মণ্ডল 53
সেরিব্রাল ক্যাচার ॥ বিকাশ বসাক 54
নিজে নিজে কর ॥ ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তী 56

ছবি এঁকেছেন : অলয় ঘোষাল।

চিঠিপত্র

উদ্ভিদের ফলের বৃদ্ধি প্রসঙ্গে

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের মার্চ সংখ্যায় দেখলাম, একজন চেতলানিবাসী ভদ্রলোক জানিয়েছেন যে, 'বাহ্যিক বল প্রয়োগে সৃষ্ট দোলন, উদ্ভিদের ফলের বৃদ্ধিকে অব্যাহত রাখে'। আমি এর একটি সম্ভাব্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বের করেছি। প্রক্রিয়াটি বা ঘটনাটি আদৌ জৈবিক কারণে হয় নি, কারণটি মূলতঃ ভৌত। ঝুলন্ত লাউ-এ বলপ্রয়োগের ফলে দোলনের সময় ওতে তাপকেন্দ্র বল ক্রিয়া করে। তার ফলে, ফলের ঠিক আগের বর্দ্ধনশীল অঞ্চলে যে অক্সিন উৎপাদিত হয় তা অন্য অংশে ছড়িয়ে যেতে পারে না। তাপকেন্দ্রে বলের প্রভাবে ফলের মধ্যেই জমা হয়। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে অক্সিন বর্দ্ধনশীল অঞ্চল হতে ফ্লোয়েম কলার মাধ্যমে উদ্ভিদের কাণ্ড ও মূলের দিকে এগিয়ে যায় অর্থাৎ এর প্রবাহ একমুখী। কিন্তু এক্ষেত্রে অপকেন্দ্র বলের প্রভাবে সেই পরিবহণ ব্যহত হয় এবং ঐ অক্সিন ফলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার দরুণ ফলের অকালপতন বন্ধ হয় এবং বৃদ্ধিও অস্বাভাবিক হয়। যেহেতু ক্রিয়াটি ভৌত, সেহেতু এই ঘটনা উদ্ভিদের প্রজাতি বিশেষের উপরে বা স্থানকালের উপরে নির্ভর করে না। আমার মতে এটিই সম্ভাব্য ব্যাখ্যা ; তবে আরো পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।

বিক্রন ঘোষ, কুলটি, বর্দ্ধমান

বিচিত্র গাছ আজও বিস্ময়

গত ফেব্রুয়ারী '84 সংখ্যায় 'বিচিত্র গাছ আজও বিস্ময়' নামে যে রচনাটি প্রকাশিত হয়, তাতে কলসপত্রী উদ্ভিদ বা ঘটপত্রী নামে এক প্রকার পতঙ্গভোজী উদ্ভিদের কথা বলা হয়েছে।

কলসের ঢাকনা সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা ঠিক কি? আমার মনে হয় এখন পর্যন্ত এমন কোন কলসপত্রী পাওয়া যায়নি, যার ঢাকনা বন্ধ। ঢাকনাটি কেবলমাত্র সাইনবোর্ডের মত পতঙ্গদের আকৃষ্ট করে। কলসের মুখের কিনারায় এক প্রকার পিচ্ছিল রস থাকে, সেখানে ব'সলেই কীট-পতঙ্গ পা পিছলে ভেতরে ঢুকে যায়। কলসের ভেতরের দেওয়াল অতি মসৃন এবং গলার নিকট নিম্নমুখী শক্ত রোঁয়া থাকে যা কপাটকের কাজ করে অর্থাৎ কীট পতঙ্গদের ভেতরে ঢুকতে দেয় কিন্তু বের হতে দেয় না। কলসীর তলদেশে এক প্রকার তরলে জড়িয়ে পড়ে এবং অধিক হ'লে ডুবে প্রাণ হারায়। কলসীর ভেতরের প্রাচীর থেকে এক প্রকার উৎসেচক নিঃসৃত হ'য়ে তাদের দেহকে পচতে সাহায্য করে এবং পাচিত দেহরস (প্রোটিন) উদ্ভিদ খাদ্যরূপে শোষণ করে।

আশুতোষ সাহা, ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ।

ডঃ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের তৃতীয় বার্ষিক স্মরণ সভা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতির যৌথ উদ্যোগে প্রয়াত বিজ্ঞান সাধক ডঃ গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যের তৃতীয় বার্ষিক স্মরণ সভা ৮ই এপ্রিল '84 রবিবার বিকাল পাঁচটায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবনে (পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬) অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবেন যথাক্রমে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধিকর্তা ডঃ শশাঙ্কচন্দ্র ভট্টাচার্য ও প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। এই অনুষ্ঠানে "জৈব আলো" শীর্ষক "গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মারক" বক্তৃতা স্লাইড সহযোগে প্রদান করবেন ডঃ কান্তিলাল চৌধুরী। সভায় সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

বিজ্ঞান সংবাদ

পূর্ব ভারত বিজ্ঞান শিবির

বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালায় 10—17 ফেব্রুয়ারী পূর্ব ভারত বিজ্ঞান শিবির বসেছিল। এখানে ওরিগ্যামি বলে একধরনের কাগজ ভাঁজ করে খেলনা বা মূর্তি বানানোর কৌশল দেখানো হয়। জাপানে এই ওরিগ্যামির চর্চা আছে। এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেছিল পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও অন্যান্য রাজ্যের বেশকিছু ছাত্র-ছাত্রী। প্রতিদিন তারা নানা রকম খেলনা বা মূর্তি তৈরী করেছে।

ঘনাদা ক্লাবের নিয়মাবলী

ঘনাদা ক্লাবের নিয়মাবলী জানতে চেয়ে আমাদের দপ্তরে প্রচুর চিঠি এসেছে। আমরা এ সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম, ঘনাদার স্রষ্টা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাছেই। তিনি এ সম্পর্কে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁর সেই চিঠি আমরা গত সংখ্যায় প্রকাশ করেছি। তিনি জানিয়েছেন, ঘনাদা ক্লাবের সদস্য হতে গেলে কোন চাঁদা লাগবে না। তবে ঘনাদা ক্লাবের সদস্য হতে যাঁরা আগ্রহী তাঁদের একটি সর্ত মানতে হবে। তা হল—নিম্নলিখিত ঘনাদাবিষয়ক দশটি প্রশ্নের মধ্যে যাঁরা অন্ততঃ তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন, তারা সাধারণ সদস্য, যারা সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন তারা বিশেষ সদস্য এবং যারা দশটির মধ্যে দশটি প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারবেন, তারাই কার্যকরী সমিতির সদস্য হবেন। —সম্পাদক

১। ঘনাদার প্রথম গল্পের নাম কি ?

২। নকল ইবন করিদের সঙ্গে ঘনাদার কোথায় আলাপ হয়েছিল ?

৩। ঘনাদার দাদার নেশা কি ছিল ?

৪। বাপী দত্তর খালি সীটে মেসে নতুন বোর্ডার হিসেবে কাকে নেওয়া হয়েছিল ?

৫। দ্বিতীয়বারের মহাকাশ যাত্রায় ঘনাদার সঙ্গী ছিলেন কে কে ?

৬। 'ইল্লুপ্ত নিবারণী' কি জিনিস ?

৭। ই. ইউ. ডব্লিউ. সি. এবং এম্. বি. ডি. ও. ই. কথা দুটির সম্পূর্ণ অর্থ কি ?

৮। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ঘটেছে অথচ মহাভারতে নেই —এমন কোন্ ঘটনা ঘনাদা কৌরবদের পরাজয়ের কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন ?

৯। 'পার্দাচিরস মার্মোরেটাস' কিসের নাম ?

১০। 'কয়া' কে ?

যাঁরা প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছেন সাধারণ সদস্য হিসেবে তাঁদের নাম ছাপা হল—শমিত রায়, 311/1, নগেন্দ্রনাথ রোড, কলি-28 ; শুভ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি2-391/1 দুর্গাপুর-10, বর্ধমান ; সোমনাথ মজুমদার, ননী মজুমদার, হাকিমপাড়া শিবাজী রোড, জলপাইগুড়ি।

বিষয় ঃ 1984 মাধ্যমিক পরীক্ষার ভৌত বিজ্ঞানের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

আনন্দের বিষয় এই যে 1984 সালে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক ভৌত বিজ্ঞানের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (যা কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার জানুয়ারী, 84 সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল) হতে এ বছর 98·8% নম্বর Common এসেছে। হিসাব নীচে দিলাম। শ্রীঅমরনাথ রায় মহাশয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত Suggestion এর প্রশ্ন নম্বর।	1984 সালের মাধ্যমিক ভৌত বিজ্ঞানের প্রশ্ন পত্রের প্রশ্ন নম্বর।	যত নম্বর Common এসেছে।	শতকরা যত নম্বর Common এসেছে
1 (a), 1 (d), 1 (b), 2 (a), 2 (c), 5 (a), 3 (b), 3 (c), 3 (c), 5 (a), 6 (b), 6 (a) 6 (c), 7 (b), 8 (b), 8 (a), 8 (c), 9 (a) 9 (c), 9 (a), 9 (c), 12 (a), 14 (a), 10 (a), 10 (a), 10 (c), 11 (a), 13 (c), 11 (b), 13 (b), 12 (c), 11 (b), 12 (b), 13 (a)।	1 (i), 1 (ii), (2 (i), 2(ii), 2 (iii), 3 (i), 3 (iii), 3 (iv), 3 (v), 4 (i) 4 (ii) 5 (i), 5 (ii), 6 (iii), 6 (i), 6 (ii), 7 (ii), 7 (iv), 8 (a), 8 (b) (ii), 8 (c), 9 (a), 9 (b), 13 (a) (i), 13 (b), 12 (a), 11 (d), 11 (b), 14 (c), 14 (d), 14 (b), 15 (d), 12 (b), 15 (b) (i), 15 (b) (ii)।	4, 5, 4+3, 1, 2, 2+2, 1, 2, 3, 4+2+3, 2+2+1, 1+1, 2, 3, 1, 3, 4, 3, 1, 4, 4, 2, 2, 2, 2, 1, 4, 2, 2, 2, =89।	90 নম্বরের মধ্যে 89 নম্বর Common এসেছে। 100 নম্বরে Common এসেছে 98·8%।

সুপ্রভাত রায়, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, 1984, পি. ডবলু. ডি. স্টাফ কোয়ার্টারস, বর্ধমান কোর্ট কম্পাউণ্ড, বর্ধমান।

বিষয় ঃ মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞান পরীক্ষা—1984

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী হতে শ্রীদিনোজকুমার দে মহাশয়কে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

Suggestion-এর প্রশ্ন নম্বর	মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞান 1984 সালের প্রশ্ন পত্রের প্রশ্ন নম্বর	নম্বর, যা Common এসেছে	শতকরা যত নম্বর Common এসেছে
9(a), 17 (xi) 3 (b), 2 (b), 3 (b), 17 (xvi), 10, 16 (a), 8, 5 (b) 3 (a), 17 (xix), 18 (xvi)	2, 7, 13 8 (ক), 6 (খ), 2 (অথবা), 2(অথবা), 5, 4, 7 (গ), 14, 10, 9	12, 2, 7, 3, $1\frac{1}{2}$, 1 8, 7, 7, 2, 4, $1\frac{1}{2}$, 3=59।	70 নম্বরে Common এসেছে 59 সুতরাং 100 নম্বরে Common এসেছে 84·2% এই হিসাবের মধ্যে 20 নম্বরের Objective প্রশ্ন ধরা হয় নি, কারণ প্রশ্নপত্রের ঐ অংশ সঙ্গে নিয়ে আসা সম্ভব হয় নি।

কুমারী মিমি লাহিড়ী, ছাত্রী, ইন্দা বালিকা বিদ্যালয়, খড়্গপুর। পিন কোড ঃ 721 305

নক্ষত্রের জন্ম এবং মৃত্যু

সমরজিৎ কর

গত বছর জুলাই মাসে গিয়েছিলাম চিলটন-এ। ইংলণ্ডের অকসফোর্ডসায়ারের ছোট্ট একটি শহর ডিডকট। এই শহরেরই কাছে ছোট্ট একটি গ্রাম চিলটন। এ অঞ্চলটা, বলতে পার, কিছুটা উপত্যকার মত। পরিষ্কার পরিবেশ! ধুলো বা ধোঁয়াশা নেই। সাধারণ লোকালয় বলতে আমরা যা বোঝ, তাও নেই। থাকার মধ্যে একটি গবেষণাগার। নাম রাদারফোর্ড গবেষণাগার। কয়েকটি বাড়ি। তার আশপাশে বড় বড় গামলার মত রেডিও টেলিসকোপ আকাশের দিকে হাঁ করে চেয়ে রয়েছে। এই দূরবীনগুলির সাহায্যে মহাকাশের ছবি তুলছেন এখানকার বিজ্ঞানীরা। কোথায় কোন্ নক্ষত্র, মহাজাগতিক মেঘ—তাদের ছবি।

এখানে পরিচয় হল বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী অধ্যাপক পি, ই, ক্লেগে-এর সঙ্গে। বছর পঁয়ষট্টি বয়েস। কি

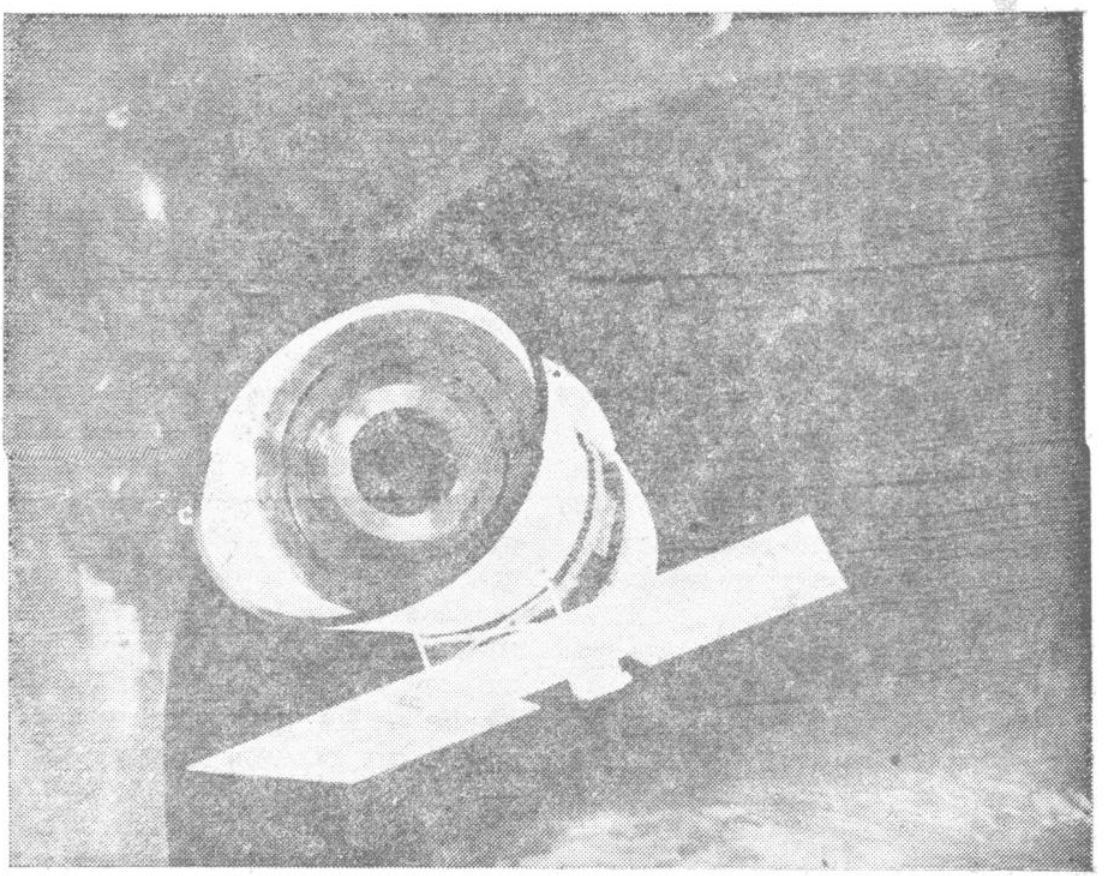

পৃথিবীর ঊর্ধ্বাকাশে পরিক্রমণ করছে ইনফ্রা-রেড উপগ্রহ (Infared Satellite বা I R S)। এই উপগ্রহতে রয়েছে দূর মহাকাশ থেকে আগত অবলোহিত রশ্মি ধরার দূরবীণ। সেই দূরবীণের সাহায্যে শিশু নক্ষত্রের ছবি তুলেছেন বিজ্ঞানীরা। দূরবীণটির বড় রকমের একটি অংশ তৈরী হয়েছে চিলটনের রাদারফোর্ড গবেষণাগারে।

তাঁর উৎসাহ! লণ্ডনের কুইল মেরী কলেজে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সঙ্গে তিনি জড়িত।

তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, নক্ষত্র সম্পর্কে নতুন কী তথ্য আপনারা জানতে পেরেছেন, অধ্যাপক ক্লেগ?

তিনি বললেন, তা হলে শুনুন, একটি জবর খবর আপনাকে দিই। আমাদের তৈরী যন্ত্র অদ্ভুত একটি নক্ষত্রের সন্ধান দিয়েছে। এতকাল যে সব নক্ষত্র আমরা দেখে এসেছি তাদের তো অনেক বয়েস। কিন্তু যে নক্ষত্রের কথা বলছি তার বয়েস কত জানেন? মাত্র দশ লক্ষ বছর। এটি একটি শিশু নক্ষত্র। আমাদের সূর্যও তো একটি নক্ষত্র। সূর্যের বয়েস প্রায় 460 কোটি বছর। 460 কোটি বছর আগে সূর্যকে যেমনটি দেখাত, নতুন এই শিশু নক্ষত্রটিও এখন দেখতে ঠিক যেন সেই রকমই। এখনো এই নক্ষত্রটি সূর্যের মত অত উজ্জ্বল হতে পারে নি।

অধ্যাপক ক্লেগকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় দেখতে পেয়েছেন এই শিশু নক্ষত্র?

তিনি বললেন, দূর মহাকাশে অন্ধকারাচ্ছন্ন ধূলিকণা এবং গ্যাসের দুটি মেঘের রাজত্বে। তাদের নাম বার্নার্ড-5 এবং লিনড্‌স—1642। দেখে শুনে মনে হচ্ছে, বার্নার্ডের মেঘ রাজ্যে কম করেও পাঁচটি শিশু নক্ষত্র ধিক ধিক করে বেড়ে উঠছে। আর লিনড্‌স—1642-এ বাড়ছে কম করেও দুটি শিশু নক্ষত্র। সূর্য তার শৈশবে যে অবস্থায় ছিল, এখন তাদের সে রকমই অবস্থা। সূর্যের মত ওই সব শিশু নক্ষত্রের চার পাশেও হয়ত গড়ে উঠছে গ্রহ উপগ্রহ।

বলতে পার, জ্যোতির্বিজ্ঞানে এটি বড় রকমের একটি আবিষ্কার। এই আবিষ্কার নক্ষত্রের জন্ম সম্পর্কে অনেক নতুন কথা জানাতে সাহায্য করবে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের।

সত্যি কথা বলতে কি, নক্ষত্রের জন্ম কথা যেন এক রহস্য।

হয়ত জিজ্ঞেস করবে, কি ভাবে জন্ম নেয় একটি নক্ষত্র?

ব্যাপারটা তা হলে বলি, শোন। আকাশের দিকে চাইলে তোমাদের কি মনে হয়, সবই ফাঁকা? তা তোমরাই বা কেন? এক সময় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও তাই মনে করতেন। তাঁরা ভাবতেন, সূর্য এবং তার গ্রহ উপগ্রহ, আরো কোটি কোটি নক্ষত্র, গ্রহাণু অথবা ধূমকেতু একমাত্র এরাই বুঝি মহাকাশে জায়গা জুড়ে থাকে। এদের মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গা পড়ে থাকে, সেখানে কিছুই নেই, একেবারে শূন্য। যেমন ধর এই পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে বায়ুস্তর। তা সেই বাতাসই বা কতটুকু? আগে বলা হত, পৃথিবী থেকে ঊর্ধাকাশে 300 মাইলের মত উঠে গেলেই বাতাসের সীমানা শেষ। তারপর সব ফাঁকা। কিন্তু এ কথা যে ঠিক নয় ঊর্ধাকাশে রকেট এবং মহাকাশযান পাঠিয়ে মানুষ তা প্রমাণ করেছে। এখন বলা হচ্ছে, পৃথিবী থেকে 900 মাইল ঊর্ধাকাশ পর্যন্ত বাতাস রয়েছে।

তারপর?

না। তারপর যে অঞ্চল, যাকে আমরা বলি মহাশূন্য —দেখা গেছে সেই মহাশূন্যও কিন্তু ফাঁকা নয়। সেখানে ছড়িয়ে থাকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধূলিকণা। যাদের বলা হয় মহাজাগতিক ধূলি। আর থাকে গ্যাস। সেই গ্যাসের বেশির ভাগই হাইড্রোজেন, সামান্য হিলিয়াম।

এবার তোমাদের একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। তোমাদের অনেকেই তো গ্রামে বাস কর। কারোর গ্রামের পাশে হয়ত বিরাট মাঠ। লক্ষ্য করেছো, সেই মাঠে মাঝে মাঝে কেমন ঘূর্ণি বাতাস বয়ে যায়? বিশেষ করে চৈত্র এবং বৈশাখ মাসে। হঠাৎ কেমন একটা দমকা বাতাস। তারপরই দেখা গেল মাঠের এক জায়গায় ঘূর্ণি। আশ-পাশের ধুলোবালি লতা পাতা কেমন বেগে সে ঘূর্ণির মধ্যে এসে পড়ছে? পাক খেতে খেতে হাজির হচ্ছে ঘূর্ণির মাঝখানে? বলতে কি, নক্ষত্রের জন্মের সময়ও ঠিক এমন ব্যাপারটিই ঘটে। প্রথম দিকে শুরু হয় প্রচণ্ড ঘূর্ণি। তার ফলে আশপাশ থেকে দ্রুত এগিয়ে আসে মহাজাগতিক ধূলি কণা এবং গ্যাস। তা জমতে থাকে ঘূর্ণির কেন্দ্রে। জমতে জমতে ঘূর্ণির কেন্দ্রে ভর বাড়তে থাকে। সেই ভরের মাধ্যাকর্ষণে তখন আরো দ্রুত এগিয়ে আসে আরো ধূলিকণা এবং গ্যাস। ফলে কেন্দ্রের ভর আরো বাড়তে থাকে। সেই সঙ্গে বেড়ে যায় মাধ্যাকর্ষণ বল। প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণ বল সৃষ্টি করে প্রচণ্ড চাপ। তোমরা তো জান, চাপ দিলে গ্যাসের তাপমাত্রা বাড়ে। তাই মাধ্যাকর্ষণের চাপে কেন্দ্রীভূত সেই ধূলিকণা এবং গ্যাস গরম হতে শুরু করে। ভর যত বাড়তে থাকে, চাপও তত বেশি হয়। প্রচণ্ড চাপে বাড়ে আরো তাপ মাত্রা। কয়লা জ্বলার সময় প্রথম দিকে কেমন লালচে আভা দেখা দেয়, ঠিক তেমনি পুঞ্জীভূত সেই ধূলিকণা এবং গ্যাসীয় বস্তু—হ্যাঁ এতক্ষণে তা একটি গোলকের মতই দেখতে হয়েছে—তা থেকে বেরোতে থাকে লাল আভা। একেই বলা হয় নক্ষত্রের শৈশব অবস্থা।

আশপাশ থেকে ওই শিশু নক্ষত্রের মাধ্যাকর্ষণের টানে আরো মহাজাগতিক ধূলিকণা, আরো গ্যাস তার উপর এসে জমতে থাকে। এতে বেড়ে ওঠে নক্ষত্রটির ভর। মাধ্যাকর্ষণের টান আরো বাড়ে। সেই সঙ্গে বাড়ে গ্যাসীয় বস্তুর উপর চাপ। চাপের প্রভাবে আরো বাড়ে তাপমাত্রা। ধীরে ধীরে উজ্জ্বল চোখ ধাঁধানো আলোর বিকিরণ। এই ভাবেই সৃষ্ট হয় একটি নক্ষত্র।

হাঁ, আরো একটি ঘটনাও ঘটে। নক্ষত্রের ভেতর তাপমাত্রা ওঠে কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও উপরে, প্রচণ্ড ওই তাপমাত্রার হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস পরস্পর মিলিত হয়ে তৈরি করে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস। সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ শক্তি—প্রধাণতঃ উত্তাপ। এ ধরনের বিক্রিয়াকেই বলা হয় তাপ পারমাণবিক সংযোজন বিক্রিয়া। ইংরেজিতে বলা হয় থার্মোনিউক্লিয়ার ফিউশন রিঅ্যাকসন। মাধ্যাকর্ষণের টানে নক্ষত্রের বস্তুসামগ্রী তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষিত হয় যেমন, তার বিপক্ষ বল হিসেবে কাজ করে ওই তাপ পারমাণবিক সংযোজনজনিত শক্তি। ফলে নক্ষত্রের বস্তু সামগ্রী নক্ষত্রের কেন্দ্রের দিকে আছড়ে পড়ে না। ওই শক্তি তাকে বিপরীত দিকে ঠেলে রাখে এর ফলেই নক্ষত্রের স্বাভাবিক আয়তন বজায় থাকে।

কিন্তু হাইড্রোজেন নিউক্লিয়স জ্বলতে জ্বলতে এক সময় কমে আসে। তখন তাপ পারমাণবিক সংযোজনজনিত শক্তির ক্ষমতা কমে যায়। প্রবল হয়ে দাঁড়ায় মাধ্যাকর্ষণ বল। তার প্রভাবে নক্ষত্র সংকুচিত হয়। তার আয়তন ভীষণ ভাবে কমে যায়। ঊনুন নেবার সময় কয়লার ছাই যেমন ফুলে ফেঁপে ওঠে, ঠিক তেমনই অবস্থা দাঁড়ায় এই সময়। নক্ষত্রের ভেতরের জ্বলন্ত অংশের আয়তন কমতে থাকে আর সেই সঙ্গে তার বাইরে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে পারমাণবিক ছাই। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, নক্ষত্রটির রঙ তখন লাল। ছাই সহ আয়তনও দাঁড়ায় বিরাট। এই অবস্থায় নক্ষত্রটিকে বলা হয় 'রেড জায়েন্ট' বা লাল দৈত্য। তারপর এক সময় মহাজাগতিক বাতাসে ওই ছাই সরে যায়। তখন পড়ে থাকে নক্ষত্রের ভেতরে উজ্জ্বল জ্বলন্ত অংশ। তার আয়তন অনেক ছোট হয়। এই অবস্থায় নক্ষত্রটিকে বলা হয় 'হোয়াইটডোয়ার্ফ' বা শ্বেতবামন।

বিজ্ঞানীরা হিসেব কষে দেখেছেন জ্বলার পর যে নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের 1·44 গুণ গিয়ে দাঁড়ায় অথবা তারও কম, একমাত্র তারপক্ষেই শ্বেতবামনে পরিণত হওয়া সম্ভব। এরপর ধীরে ধীরে সেই নক্ষত্র শীতল হতে থাকে। এক সময় তার তেজ যায় কমে। অনেকে মনে করেন, এরপর সম্পূর্ণ শীতল হয়ে ঘটে তার মৃত্যু। আবার কারোর কারোর মত, এরপর প্রচণ্ড বিস্ফোরণের পর তার নক্ষত্র-জীবন শেষ হয়ে যেতেও পারে।

তবে যে সব নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের দুই অথবা তিন গুণ, তাদের মাধ্যাকর্ষণ বলও বেশি। এত বেশি যে সেই মাধ্যাকর্ষণ বলের চাপে ওই ধরণের নক্ষত্রের আয়তন ভীষণভাবে কমতে থাকে। তোমরা জান, পরমাণুর চারপাপে ঘোরে ইলেকট্রন কণা। পরমানুর নিউক্লিয়াসে থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন। অবশ্য হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস ছাড়া। প্রচণ্ড চাপে ইলেকট্রন কণা নিউক্লিয়াসের মধ্যে ঢুকে যায়। সেখানে গিয়ে প্রোটনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সৃষ্টি করে নিউট্রন। তখন সেই নক্ষত্রে বস্তু বলতে থাকে নিউট্রন আর কিছু তেমন থাকে না। এই ধরণের নক্ষত্রকে বলা হয় নিউট্রন নক্ষত্র। সূর্য যদি নিউট্রন নক্ষত্রে রূপান্তরিত হয় তখন তার ব্যাসার্ধ গিয়ে দাঁড়াবে 60 কিলোমিটারের মত। আর তার এক ঘন সেন্টিমিটার ভরের ওজন দাঁড়াবে 1000 কোটি টন।

আরো আছে। নক্ষত্রের ভর যদি সূর্যের ভরের তিনগুণের বেশি হয়, পারমাণবিক জ্বালানি শেষ হওয়ার পর তার অবশিষ্ট ভরের মাধ্যাকর্ষণে সেই নক্ষত্র সংকুচিত হবে প্রচণ্ড ভাবে। হবে আরো নিরেট। তখন বলতে গেলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিই থাকবে তার একমাত্র শক্তি হিসেবে। আয়তন হবে ক্ষুদ্র। সূর্য সেই অবস্থায় গেলে তার ব্যাসার্ধ হবে 20 কিলোমিটারের মত। এখন বস্তুর পরিমণ্ডল থেকে প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণ বল উপেক্ষা করে কোন কিছুই বেরিয়ে আসতে পারে না। এমন কি আলোও নয়। অর্থাৎ তার প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণ বল আলোক শক্তিকেও টেনে রাখে। আর কোন রকম বিকিরণ আসে না বলে, এ ধরনের নক্ষত্র আমাদের চোখে অদৃশ্যই থেকে যায়। তাই এদের নাম রাখা হয়েছে 'ব্ল্যাক হোল' বা কৃষ্ণ গহ্বর। কোন কোন জ্যোতির্বিজ্ঞানী মনে করেন 'ব্ল্যাকহোল'—ই নক্ষত্রের শবদেহ। ইদানীং অবশ্য কেউ কেউ বলছেন 'ব্ল্যাকহোল' থেকেও বিকিরণ বের হয়। তবে তা খুবই নগণ্য।

সংক্ষেপে এই হল নক্ষত্রের জীবন বৃত্তান্ত। কেমন? ভাবতে গেলে অবাক হতে হয় না?

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র সংবাদ

বরুণ মজুমদার

তুষার মানব

হিমালয়ের তুষার মানব নিয়ে অনেক গল্প শোনা যায়। অনেকে পর্বত অভিযানে গিয়ে এই সব তুষার মানবের বড় বড় পায়ের ছাপ পর্বতের তুষারের ওপর লক্ষ্য করেছেন। হিমালয়ের রহস্যজনক এই সব তুষার মানবের আত্মীয় রয়েছে সাইবেরিয়ার বনাঞ্চলে আর বরফ তুন্দ্রা অঞ্চলে। অনেকে এই তুষার মানবকে চোখে দেখেছেন বলে দাবী করেছেন। যারা চোখে দেখেছেন তাদের বর্ণনা অনুযায়ী এই সব তুষার মানব দেখতে মানুষেরই মতো। তবে তাদের কপালটা নিচ, আর মুখের চোয়াল দুটো যেন বেরিয়ে এসেছে। এদের আছে লম্বা লম্বা হাত আর লম্বা লম্বা পা। এই সব প্রাণী দেখতে মানুষেরই মতো। তবে তাদের সারা শরীর লোমে ভর্তি। এরা মানুষের মত রান্না করে খায় না। এরা খায় বন্য হরিণের কাঁচা মাংস। থাকে ভাল্লুকের মতো গর্তের মধ্যে। কিছুদিন আগে সাইবেরিয়ার বনাঞ্চলে ষাটজন শিকারী বন্য হরিণ শিকার করতে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে আটচল্লিশজন শিকারী এই তুষার মানব বা ইয়েতীকে দেখেছেন। ঐ শিকারীরা এর নাম দিয়েছেন Chunchuna.

এই বিচিত্র প্রাণীদের সম্পর্কে আমাদের দেশেই নয়, সারা পৃথিবীতে চলছে নানান গবেষণা, তবে কেউই এই প্রাণীকে জ্যান্ত ধরে এনে গবেষণাগারে পরীক্ষার কাজ এখনো চালাতে পারেন নি। শুধু জ্যান্ত নয়, কোনো মৃত ইয়েতীকেও কেউ গবেষণাগারে নিয়ে আসতে পারেন নি। এদের চলাফেরা সত্যিই রহস্যজনক।

বিচিত্র রেঁস্তোরা

ঈশ্বরের পক্ষে মানুষকে মিষ্টিতে পরিণত করাটা হয়ত খুব সহজ, কিন্তু নিষ্ঠুরতা থেকে মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটানো কষ্টকর। হংকং-এর একটি রেঁস্তোরা এক ঘোষণায় জানিয়েছে যে, তারা এখন থেকে শুধু আমিষ জাতীয় খাদ্যই নয়; উপরন্তু বাঁদর পাখি প্রভৃতি জীবন্ত পশুখাখি খাবারের জন্য ডিসে করে সরবরাহ করবে।

ঐ রেস্তোরাটি ঘোষণা করেছে যে, 5 হাজার ডলার দাম নিয়ে এই রাজকীয় ভোজের খাবার সরবরাহ করবে। এই রাজকীয় খাদ্য তালিকায় আছে ভাল্লুকের থাবা, টিয়া পাখির জীব, খেঁকশিয়াল, বুনোশুয়োর, হাঁসের ঠ্যাং ঝলসানো প্রভৃতি। জীবন্ত রাজহাঁসের ঠ্যাং কেটে সেই ঠ্যাং টেবিলে রাখা উত্তপ্ত প্লেটের ওপর দেওয়া হয়। ঠ্যাংগুলো তখনও নড়া চড়া করতে থাকে। সিঙ্গাপুর সরকার ঐ রেস্তোরার মালিকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, তারা যদি ঐ সব সামগ্রী খাবার হিসাবে সরবরাহ করতে চান, তবে তা সুপের মধ্যে দিতে পারবেন কিন্তু ঐভাবে নয়।

140, রামকৃষ্ণপুর লেন, হাওড়া-2

পরমাণুর গোপন কথা

সুদীপ কুমার রায়

পরমাণু অর্থাৎ ইংরেজী অ্যাটম (atom) শব্দটি গ্রীক ভাষা থেকে নেওয়া। 'a' অর্থ না, 'tomes' অর্থ বিভাজন ; অর্থাৎ যাকে বিভাজন করা যায় না। ভারতীয় বিজ্ঞানী কনাদ, গ্রীক বিজ্ঞানী ডেমোক্রিটাস প্রমুখ বিশ্বাস করতেন যে পরমাণু অবিভাজ্য। কিন্তু পরবর্তীকালের প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক যথা : রাদারফোর্ড, নীলস্ বোর, অটোহান, স্ট্রাসম্যান প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা বহুদিনের আগত পুরনো ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের এক শুভ মুহূর্তে (নাকি অশুভ মুহূর্তে) পরমাণু বিভাজনে হলেন সমর্থ, জন্ম দিলেন অভিশপ্ত পরমাণু বোমার।

আমরা জানি পরমাণু মূলতঃ তিন ধরণের কণা দ্বারা গঠিত—নিউক্লিয়াসের ধনাত্মক আধানযুক্ত প্রোটন, তড়িৎ নিরপেক্ষ নিউট্রন এবং ঋণাত্মক আধানযুক্ত বহিঃকক্ষে পরিভ্রমণ রত ইলেকট্রন।

ইলেকট্রনের ব্যাসার্ধ—$2{\cdot}818\times10^{-23}$ cm. (সেমি)
ভর—$9{\cdot}1\times10^{-28}$ gm. (গ্রাম)
আধান—$-1{\cdot}6\times10^{-19}$ কুলম্ব
প্রোটনের ব্যাস—$1{\cdot}4\times10^{-13}$ cm.
ভর—$1{\cdot}6725\times10^{-24}$ gm.
আধান—$+1{\cdot}6\times10^{-19}$ কুলম্ব
ঘনত্ব—4×10^{14} গ্রাম/ঘন সেমি
জেমস চ্যাডউইক দ্বারা আবিষ্কৃত
নিউট্রনের ভর—$1{\cdot}6748\times10^{-24}$ gm.
ব্যাসার্ধ—$1{\cdot}4\times10^{-13}$ cm.
এবং ইহা তড়িৎ নিরপেক্ষ।

সাধারণতঃ কোন তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে (যেমন—ইউরেনিয়াম) অনবরত কণাস্রোত বা শক্তি স্রোত বের হচ্ছে, বের হচ্ছে ওজন চারেকের একটি করে হিলিয়াম পরমাণু। এদের হাফলাইফ বিভিন্ন। নিউক্লিয়াস থেকে তিন ধরনের স্রোত বের হতে পারে—আলফা (α), বিটা (β) ও গামা (γ) রশ্মি। আলফা রশ্মি ধনাত্মক আধানযুক্ত হিলিয়াম নিউক্লিয়াস, বিটারশ্মি ধনাত্মক আধানযুক্ত পজিট্রন এবং গাম রশ্মি হল উচ্চশক্তি সম্পন্ন তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ। এদের সামনে চুম্বক স্থাপন করলে তিনটি কণাস্রোত তিনদিকে যায়। ডালটনের তত্ত্ব অনুযায়ী যে পরমাণু ছিল অবিভাজ্য, পরবর্তীকালে তারই নিউক্লিয়াসকে বিভাজন করে পরমাণু বোমার সৃষ্টি।

পরমাণু বিভাজন বলতে প্রধানতঃ নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে বোঝায়। এক্ষেত্রে ইলেকট্রনের গুরুত্ব অগ্রাহ্য করা হয়, কেননা ইলেকট্রন সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি পরমাণুর মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে অসমর্থ। নিউক্লিয়াসের বিভাজন খুবই জটিল, একটি বড় গোলাকার তরল বিন্দুকে নাড়ানো হলে তা যেমন কাঁপতে থাকবে এবং একাধিক বিন্দুতে পরিণত হবে, তেমনি ভারী নিউক্লিয়াসকে উত্তেজিত করে দুটি নিউক্লিয়াসে বিভাজিত করা যায়। কিন্তু প্রথম নিউক্লিয়াসে যে বিরাট সংখ্যক নিউট্রন থাকে তার সবকটি হাল্কা নিউক্লিয়াসে স্থান পায় না। কেননা হাল্কা নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রনের অনুপাত অপেক্ষাকৃত কম। তাই কিছু নিউট্রন উদ্বৃত্ত থাকে। ঐ অবশিষ্ট নিউট্রন আবার নূতন করে নিউক্লিয় বিভাজন শুরু করে। যেমন—ইউরেনিয়াম (যার নিউট্রন সংখ্যা 143) বিভাজনের ফলে জেনন ও স্ট্রনশিয়াম নিউক্লিয়াসে পরিণত হলে (যাদের যৌথ নিউট্রন ধারণ ক্ষমতা 132) 11টি নিউট্রন উদ্বৃত্ত থাকে। এই অবিরাম বিভাজনকেই শৃঙ্খলবিক্রিয়া বলে।

নিউট্রনের ব্যাসার্ধ 1·4 ফের্মি, ঘনত্ব 4×10^{14} গ্রাম

সি.সি নিউক্লিয়াসে উত্তেজিত পদ্ধতিটি জটিল। ইহা সাধারণতঃ দ্বিবিধ—প্রোটনের অবশোষণ এবং নিউট্রনের অবশোষণ। ধনাত্মক তড়িৎধর্মী প্রোটন অপেক্ষা অনাহিত নিউট্রন দ্বারা বিভাজন সহজসাধ্য বলে অপেক্ষাকৃত কম শক্তির সাহায্যে সাইক্লোজোম যন্ত্রে ভারী নিউক্লিয়াসকে প্রবেশ করানো হয়। এই নিউট্রন অবশোষণে নিউক্লিয়াস হয় উত্তেজিত।

পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জ্বালানি। বর্তমানে আমরা রেডিও এবং খবরের কাগজে প্রায়ই দেখতে পাই যে আমেরিকা ভারতের তারাপুর পারমাণবিক কেন্দ্রের জন্য সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম চুক্তিমত পাঠাতে অযথা নানা টালবাহানা করে দেরী করছে। এর ফলে পারমাণবিক কেন্দ্রটির নানা ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এখন এই সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম কি? প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামে তিনটি আইসোটোপ—$92U^{234}$, $92U^{235}$, $92U^{238}$। এদের মধ্যে $92U^{234}$ বিরল এবং $92U^{238}$ অনুপযুক্ত। তাই শেষ সম্বল $92U^{235}$ কিন্তু হায়, প্রকৃতিতে এর পরিমাণ আবার খুব কম মাত্র 0·7%। তাই, সাধারণ ইউরেনিয়াম থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম বা ইউরেনিয়াম—235 তৈরী করা হয়।

শৃঙ্খল বিক্রিয়া শুরু করার জন্য যে পরিমাণ জ্বালানী প্রয়োজন, তাকে বলে সংকটভর। প্রতিটি পরমাণু বিভাজনে গড়ে 2·5টি নিউট্রন মুক্ত হয় এবং এরাই বিক্রিয়ায় অংশ নেয়। সংকটভর পরিমাণ ইউরেনিয়াম—235 একত্রে রাখলেই বিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। বিক্রিয়া শুরু করানোর জন্য প্রয়োজনীয় ইলেকট্রন সরবরাহ করে প্রকৃতির গৌণ মহাজাগতিক রশ্মি। এজন্য দুটি সীসের তৈরী অর্ধগোলক তৈরী করে তাতে প্রতিটিতে সংকট ভরের বেশী ইউরেনিয়াম রাখা হয়। এবং বোমা তৈরীর সর্বশেষ ধাপ হল দুটি অর্ধগোলককে একত্রিত করে পূর্ণ গোলকে রূপ দেওয়া।

দুটি পিণ্ডকে যুক্ত করে দেওয়ার এক সেকেণ্ডের কম সময়েই বিস্ফোরণ হবে। বোমার অভ্যন্তরের উষ্ণতা কয়েক কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড হয়। ফলে অভ্যন্তরের চাপ প্রবলভাবে বেড়ে যাওয়ায় উহা বিস্ফোরিত হয়।

এই বোমার ধ্বংসকারী ক্ষমতা অকল্পনীয়। প্রথমতঃ উচ্চচাপ ও উষ্ণতায় বিস্ফোরণ হলে জ্বলন্ত গ্যাসের এক ক্রমবর্ধমান গোলক দেখা যায়, যার আওতায় এলে সমস্ত কিছুই ভস্ম হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ মুক্ত নিউট্রন ও গামা রশ্মি বায়ুকে আয়নিত করে ও প্রাণীরা শ্বাস-প্রশ্বাসের দরুণ সেই বিষাক্ত বায়ুকে গ্রহণ করে এবং জটিল দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সার প্রভৃতিতে আক্রান্ত হয়। তৃতীয়তঃ উত্তপ্ত গ্যাস ও বোমার টুকরো ঘণ্টায় 100 মাইল বেগে ছুটে চলে। ফলে সেই শূন্যস্থান পূরণের জন্য আশপাশের বায়ু প্রবলবেগে ছুটে আসে এবং বিরাট এলাকা ব্যাপী ক্ষয়সাধন করতে শুরু করে। চতুর্থতঃ তেজস্ক্রিয়তার অভিশাপ গাছপালা, প্রাণীর দৈহিক বিকৃতির মাধ্যমে বংশানুক্রমিক স্বাক্ষর বহন করে।

কিন্তু এত গেল পরমাণুর সর্বধ্বংসী ভয়ংকরী রূপ। কিন্তু মেঘের আড়ালে সূর্যের মত এই শক্তির কল্যাণকামী রূপটিও আত্মপ্রকাশ করছে সেটি খতিয়ে দেখা যাক। পরমাণু শক্তির পরিধি বিশাল এবং সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল, অভাব শুধু সুযোগ্য ব্যবহারের। নিউক্লিয়াসের মধ্যে বন্ধনশক্তি (Binding Energy) ও পাইসেন কণা এক্ষেত্রে উল্লেখের দাবী রাখে। একটি ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিভাজন 200 মেগাওয়াট শক্তি গতিশক্তি ও তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের আকারে নির্গত হয়, যার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় গাইডার কাউণ্টারে। একগ্রাম ইউরেনিয়ামে 3×10^{24}টি পরমাণু আছে এবং এর থেকে প্রাপ্ত তাপ শক্তি 3 টন কয়লা থেকে প্রাপ্ত তাপশক্তির সমান। তাই বর্তমানে মানুষের শক্তি সম্পর্কীয় চিন্তাভাবনা পরমাণুকে ঘিরেই শুরু হয়েছে। পরমাণু শক্তি চালিত বরফ কাটার জাহাজ, সাবমেরিন, যুদ্ধ জাহাজ, বজ্রপাতি এবং সর্বোপরি বর্তমান সভ্যতার রূপকার বিদ্যুৎশক্তি হিসাবে আজকাল বেশীরভাগ উন্নত দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে।

অতএব পরমাণু শক্তিকে বর্তমানে সর্বধ্বংসী বোমা তৈরীর অপকর্মে লিপ্ত না করে বাস্তবসম্মত মানবকল্যাণ-মুখী সেবায় নিয়োজিত করা উচিৎ। কারণ আজ যদি আবার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়, তা হলে তা হবে পরমাণু বোমাভিত্তিক যার পরিণামে সমগ্র মানব তথা জীবজগতের বিলুপ্তি ঘটবে। কিন্তু এই ধ্বংসাত্মক রূপের পাশে পরমাণুর কল্যাণাত্মক রূপটি কিন্তু দারুণ আশাব্যঞ্জক। আজ বিশ্বের কয়লা, পেট্রোলিয়াম, গ্যাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিগুলি ক্রমান্বয়ে উত্তোলনের ফলে সীমিত হয়ে আসছে ফলে পৃথিবীকে আর কয়েক দশকের পরেই শক্তি সম্পর্কীয় দারুণ সমস্যায় পড়তে হবে—যে সমস্যা থেকে একমাত্র পরমাণুই মুক্তি দিতে পারবে। আর তখনই সার্থক হবে হাইমার অটোহানস্টাসম্যানের স্বপ্ন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—সন্দীপ পাল "ভয়ংকর সুন্দর পরমাণু"

37/বি, প্রসন্ন নস্কর লেন, কলিকাতা-39

বিজ্ঞানভিত্তিক ধারাবাহিক উপন্যাস

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সবুজ বনের গান

॥ এগারো ॥

স্বপ্ন কিংবা স্বপ্ন নয়

ফাঁকা মাঠে গিয়ে পড়তেই হত্যাকারীর অমানুষিক গর্জন আর আক্রান্তের আর্তনাদ ক্রমশ মিলিয়ে গেল। অমনি আমার সম্বিৎ ফিরে এল। মনে পড়ে গেল সকালের সেই 'স্টপ্ ইট্' বলে ধমকের কথা। কিওটা দ্বীপে এই সব অদ্ভুত চিৎকার-চেঁচামেচি যে নিছক অতীতের কিছু ঘটনার অলীক প্রতিধ্বনি, তাতে ভুল নেই। হাতের পাথরটা ফেলে দিলাম।

কিন্তু অবাক লাগল নিজের এই উত্তেজনা আর উন্মাদনা দেখে। আমি কি খুব শিগরির পাগল হয়ে যাব? এই অত্যাশ্চর্য দ্বীপ আমাকে বদ্ধ পাগলে পরিণত করে ফেলবে, যদি না আমি সচেতন থাকি প্রতিমুহূর্তে। খাড়ির ধারে যেতে যেতে সকালে করুন বেহালার সুর শুনে আমি তো কেঁদে ফেলেছিলুম প্রায়! ভাগ্যিস প্রচণ্ড ক্ষিদে আমার মানসিক সুস্থতা ফিরিয়ে দিয়েছিল।

শান্তভাবে দাঁড়িয়ে ভাবছিলুম, আমি জয়ন্ত চৌধুরী। কলকাতার দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সাংবাদিক। ঘটনা-চক্রে এই ভূতুড়ে দ্বীপে এসে পৌঁছেছি। আমার মাথাটা ঠিক রাখতেই হবে। এইসব বিচিত্র প্রাণবন্ত ও সচেতন উদ্ভিদের ব্যাপার-স্যাপার খুঁটিয়ে জানতে এবং বুঝতে হবে। ভড়কে যাওয়া চলবে না।

আমার খুব কাছেই একটা ফুট চারেক উঁচু চওড়া পাতলাওয়ালা ঝোপ ছিল। তার ডগায় বেগুনি রঙের থোকা থোকা ফুল। ফুলের ডাঁটিগুলো শুঁড়ের মতো দেখতে। হঠাৎ সুড়সুড়ি খেয়ে চমকে উঠে দেখি, কয়েকটা ফুলওয়ালা শুঁড় আমার ছেঁড়া শার্টের ভেতর দিয়ে পাঁজরে ঘষা খাচ্ছে। একটু সরে গেলুম। শুঁড়গুলোও আমার নাগাল পেতে ঘুরে এল। কী করে দেখার জন্য আমি হাত বাড়িয়ে দিলুম। আমার হাতটা পেঁচিয়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িয়ে নিলুম এক ঝটকায়। তারপর দেখি ঝোপটা ভীষণ কাঁপতে কাঁপতে এপাশে ওপাশে লুটোপুটি খাওয়ার তাল করছে।

সঙ্গে সঙ্গে টের পেলুম, ঝোপটা তার নিঃশব্দ ভাষায় খিলখিল করে হাসছে। আমার সঙ্গে দুষ্টুমি করছিল বুঝি—আমার ভয় পাওয়া দেখে এখন হেঁসে বাঁচে না। আমি ভেংচি কেটে বললুম, 'লজ্জা করে না হাসতে? আমার মতো দুর্ভাগার সঙ্গে রসিকতা করতে একটুও বাধছে না?'

রাগ করে হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা তফাতে চলে গেলুম। এখানে পায়ের তলার ঘাস যেন ঘাস নয়। মখমলে মোড়া ফোম। কয়েক টুকরো পাথরের ভেতর থেকে একটা লিকলিকে গাছ উঠেছে—আমার মাথার সমান উঁচু। পাতাগুলো দেবদারুর মতো দেখতে। গাছটায় পিচকলের মতো অজস্র ফল ধরে আছে। দেখা যাক, এই গাছটা আমাকে একটা ফল দেয় নাকি।

ভাবা মাত্র গাছটা আমার দিকে ঝুঁকে এল। এমন কি একটা ফলে ভর্তি ডাল এগিয়ে এসে আমার ঠোঁট স্পর্শ করল। মুখ সরিয়ে নিতে গিয়ে মনে হল, এই দয়ালু বৃক্ষ মশাই আমাকে যখন তার ফল খাওয়াতেই চাচ্ছে, তখন প্রত্যাখ্যান করাটা উচিত হবে না। তাকে আরও পরীক্ষা করার জন্য আমি হাঁ করলুম। একটা থোকা এসে আমার মুখের ভেতর ঢুকে গেল।

আহা, কী অপূর্ব স্বাদ ফলগুলোর। কয়েক থোকা ফল সাবাড় করে গাছটাকে সাষ্টাঙ্গে একেবারে প্রণিপাত করে ফেললুম। তারপর দারুন স্ফূর্তি লাগল। খোলা বিরাট মাঠটায় দৌড়ুতে শুরু করলাম। কখনও ডিগবাজি খেয়ে, কখনও ছুটোছুটি করে একটি ধেড়ে শিশু হয়ে পাখির ঝাঁকের পেছনে তাড়া করে সে এক উদ্দাম স্ফূর্তি!

তারপর গান গাইতে ইচ্ছে করল। তার পরে গান ধরলুম—মাথায় যা এল, সেই কথা দিয়ে আগডুম-বাগডুম একখানা বিকট গান।

'স্বগ্‌গে এসে গেছি ভাইরে
স্বগ্‌গে এসে গেছি হো হো স্বগ্‌গে এসে গেছি...'

কতক্ষণ পরে আবার সম্বিৎ ফিরল। থমকে দাঁড়ালুম।

লজ্জা করে না হাসতে?

এ আমি কী করছি? সর্বনাশ যে পাগলামির লক্ষণ ফুটে বেরুচ্ছে আমার আচরণে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। কখন বিকেলের গাঢ় পাট্‌কিলে রঙের রোদ ফুরিয়ে ধূসরতা ঘনিয়ে উঠেছে। চারপাশে নীলাভ কুয়াশা জমে উঠেছে। আমার পায়ের কাছে ঠাহর করে দেখি, ব্যুমেরাং গড়নের কাঠপোকাদের দল ঘামে মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে। আঁতকে উঠে সরে গেলুম।

তারপর সোজা পুবের বিচের দিকে হনহন করে চলতে থাকলুম। ওদিকটা ফাঁকা। সমুদ্র জুড়ে আবছা লালচে আভা মিলিয়ে গেল। প্রবাল পাঁচিলের ভাঙা অংশটার ওপারে দিগন্ত রেখা আর চেনা যাচ্ছিল না। কিন্তু বাতাসটা কেমন যেন ঈষদুষ্ণ ফুলের সুন্দর গন্ধ সন্ধ্যার মুখে আরও ঝাঁঝালো হয়ে উঠেছে। ওপর দিক্‌টায় পাথরের চওড়া চাতাল মতো একটা জায়গায় বসে পড়লুম।

শুঁড়ের মতো শিসওয়ালা সেই বেগুনি ফুলের আচরণের কথা মনে পড়ছিল। মনে পড়ছিল ফলদাতা শীর্ণ গাছটার কথাও। এর একটা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা থাকা উচিত বৈকি। কোনো লতানে গাছ কোনো জিনিসকে আঁকড়ে ধরে পেঁচিয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করে। এতে তার বহুক্ষণ সময় লাগে। এমন যদি হয়, লতানে গাছটার এই গতিকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে কী হবে? ওই বেগুনি ফুলের শিসের মতোই আচরণ করবে না কি? তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে নাড়িয়ে দিয়েছিলুম মনে পড়ছে। একটা ব্যাখ্যা এ থেকে মেলে। আমার শরীর থেকে খানিকটা গতিশক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল গাছটার মধ্যে। তার সঙ্গে যদি তার নিজের গতিশক্তি যোগ করা হয়, তাহলে দ্বিগুণ গতির চাপে সে কাঁপবে, কিছুক্ষণ ধরে আন্দোলিত হবে। এ তো স্বাভাবিক ব্যাপার।

আর ওই ফলের গাছটার মধ্যে এমন কোনো উপাদান আছে, আমার শরীরের কোনো উপাদান যাকে আকর্ষণ করতে পারে। হয়তো আমার মুখের ভেতর সেই আকর্ষণ জিনিসটা আছে—চুম্বকের মতো তার টান।

আমার সাধারণ বুদ্ধিতে এইসব ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে ফেললুম। সেই চিৎকার-চেঁচামেচির একটা ব্যাখ্যা আগেই এসেছে। এ বিশ্বের স্পেস বলতে যা বোঝায়, তা কিন্তু আদতে শূন্য নয়। আধুনিক বিজ্ঞানীর মতে, শূন্যস্থান বলে কিছু নেই। আর স্পেসে সব ধ্বনি আসলে স্পন্দনের তরঙ্গরেখা হয়ে অনন্তকাল আঁকা থেকে যায়। তেমনি সব দৃশ্যের চিত্ররূপও হয়তো স্থানকালব্যাপী অক্ষয় হয়ে থাকে। হিরোশিমোয় এ্যাটম বোমা পড়ার সময়কার দৃশ্যগুলি পরবর্তী সময়ে বহুরাত্রে ভেসে উঠতে দেখা গেছে। ঠিক তেমনি করে বহুবছর আগের কোনো চিৎকার এই কিওটা দ্বীপের

উদ্ভিদের কোষে কোষে তরঙ্গরেখা হয়ে গ্রামোফোন রেকর্ড বা ক্যাসেট টেপের মতো আঁকা হয়ে গেছে। কোনো কোনো সময় প্রাকৃতিক কারণেই রেকর্ডগুলি বেজে ওঠে। প্রকৃতিতে তো সত্যি করে ধ্বংস বলে কিছু নেই। একদিক থেকে যা ধ্বংস, অন্যদিক থেকে তাই সৃষ্টি। কোনো কিছু শূন্যে নিঃশেষিত হবার নয়। সবকিছুর রূপান্তর আছে, ধ্বংস নেই।

কিন্তু কবে কতবছর আগে কে কাকে নিষেধ করেছিল 'স্টপ ইট' বলে? কী করছিল অন্য লোকটি যে তাকে থামতে বলতে হয়েছিল? আর কেই বা 'আই মাস্ট কিল ইউ' বলে হিংসায় গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কার ওপর? তারা কারা? ভাষা শুনে মনে হয় তারা ইংরেজ। নিশ্চয় দ্বীপের কোথাও তাদের কোনো চিহ্ন এখনও খুঁজে পাওয়া যাবে। প্রিয়বর্ধন বলেছিল, এই দ্বীপে নাকি জলদস্যুদের গুপ্তধন লুকোনো আছে। তারা কি একদল জলদস্যু? প্রবাল পাঁচিলে ধাক্কা লেগেই কি জাহাজ ডুবি হয়ে তারা এই দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিল?

হঠাৎ কোথায় ক্ষীণ সুরে মাউথ অর্গান বেজে উঠল। আমি আর বসে থাকতে পারলুম না। সুর লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলুম আবছা অন্ধকারে। সুরটা আসছে সোজাসুজি দক্ষিণ দিক থেকে। বিচ ধরে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে ডানদিকে তাকালাম। তারপর চেঁচিয়ে বললুম, 'কে তুমি?

বাজনা থেমে গেল। কয়েকবার অকারণ ডাকাডাকি করে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেলুম। জলের ধারে পৌঁছুতেই কালো একটা জিনিস চোখে পড়ল। একটু ঝুঁকে দেখেই চমকে উঠলুম। মানুষই বটে। অমনি মনে হল, প্রিয়বর্ধন নয় তো? প্রিয়র্ধন হতেও পারে, নাও পারে। কিওটা-দ্বীপে সব কিছু উল্টোপাল্টা ব্যাপার।

কিন্তু আজ সারাটাদিন একটা অদ্ভুত মানসিকতা নিয়ে কাটিয়েছে। প্রিয়বর্ধনের কথা যেন ভুলেই গিয়েছিলুম। কদাচিৎ তার কথা মনে পড়লেও আমল দিই নি। আসলে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থেকেছি। ইশ। কী অকৃতজ্ঞ আমি! আমি দিব্যি তীরে পৌঁছুতে পারলুম আর সে-বেচারা কোথায় অসহায় হয়ে ভেসে গেল—তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করা দূরে থাক, তাকে খুঁজে দেখার চেষ্টাও করলুম না!

নিজের ওপর খাপ্পা হতে হতে নিঃসাড় দেহটার গায়ে হাত রাখলুম। বুকের স্পন্দন অনুভব করে বোঝা গেল, যাই হোক, লোকটা মরে নি। কিন্তু এই অন্ধকারে সে প্রিয়বর্ধন কি না বোঝার উপায় নেই। লোকটিকে কিছু-ক্ষণ উত্তাপ দিতে পারলে তার জ্ঞান ফিরে আসবে। কিন্তু অন্ধকারে শুকনো কাঠ খুঁজে আনাই সমস্যা। পা দুটো জলে এবং শরীর ডাঙায় পড়ে আছে লোকটার। ঢেউ এসে তার পায়ের ওপর আছড়ে পড়ছে। তবে অনুমান, জোয়ার ও ভাঁটার মাঝামাঝি সময়ে লোকটা এখানে পৌঁচেছে। কিংবা এমনও হতে পারে ঢেউয়ে ভেসে এসেছে। একে সরিয়ে না নিয়ে গেলে আবার ভেসে যেতে পারে জোয়ারের টানে।

বালির ওপর তাকে টানতে টানতে উঁচু জায়গায় নিয়ে গেলুম। তারপর কী করা যায় ভাবছি, হঠাৎ লোকটা অস্পষ্ট শব্দ করল।

তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে চেতনা ফেরানোর চেষ্টা করলুম। কিন্তু আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

তাকে ফেলে চলে যেতে পারি না—আর যাবই বা কোথায়? একটু তফাতে আমি বালির ওপর চিত হয়ে শুয়ে পড়লুম। অচেতন হোক, কিংবা মড়াই হোক জনমানবহীন দ্বীপে মাঝেমাঝে ওই সব ভৌতিক চিৎকার আর বাজনার মধ্যে অন্তত একজন মানুষের কাছে শুয়ে থাকাটা অনেক ভাল। মনে জোর পাওয়া যায়।

ঘুম ভাঙল রোদের তাপ লেগে। সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গীর কথা মনে পড়ল। ধুড়মুড় করে উঠে দেখি, তার পাত্তা নেই।

এ তো ভারি ভয়ের কথা! কোনো জন্তুজানোয়ার তুলে নিয়ে যায় নি তো? এদিক ওদিকে তাকিয়ে তাকে খুঁজছি, সেই সময় অজানা ভাষায় একটা চেঁচামেচি কানে এল। ঝটপট উঠে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল, ঘাসের মাঠে দু হাত ওপরে তুলে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে এদিকেই দৌড়ে আসছে আমার মতো ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক পরা এক পাগলাটে মূর্তি এবং সে আর কেউ নয়, শ্রীমান প্রিয়বর্ধন!

আমাকে দেখে সে চেঁচিয়ে উঠল আগেকার মতো ভাঙাভাঙা ইংরেজিতে—'পালাও, পালাও।'

দৌড়ে আমার পাশ কাটিয়ে সে জলে ঝাঁপ দেবার উপক্রম করলে আমি তাকে ধরে ফেললুম। প্রিয়বর্ধন হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'ভূত! ভূত! এ দ্বীপে ভূতের আস্তানা আছে, জয়ন্ত!'

তাকে ধাতস্থ করতে বেগ পেতে হল। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করার পর আগাগোড়া মোটামুটি সব ঘটনা বললুম। সে কান করে শুনে একটু হাসল। 'তোমার সঙ্গে আমার ভাগ্য জড়িয়ে গেছে। তবে তুমি ওই যে বললে, সারা রাত আমাকে চিনতে পারনি—এটা তোমার উচিত হয় নি, জয়ন্ত। আমি হলে ঘোর অন্ধকারেও

আর কেউ নয়, শ্রীমান প্রিয়বর্ধন

তোমাকে ছুঁয়েই টের পেতুম। সূর্যের তাপ পেয়ে আমার জ্ঞান ফিরে দেখি, পাশে তুমি! আমি তো হতভম্ব একেবারে। ঘুমুচ্ছ দেখে আর জাগালুম না। জলটা যা ঘোলা, একটাও মাছ দেখা গেল না। তখন ওদিকে গেলুম, দেখি কিছু খাদ্য যোগাড় করা যায় নাকি। অন্তত শুকনো নারকোল গোটাকতক। কিন্তু এমন অখাদ্য দ্বীপ কে কবে দেখেছে, সেখানে নারকোল গাছের বালাই নেই! খানিকটা গিয়ে চোখে পড়ল একটা আপেল গাছ। যেই হাত বাড়িয়েছি, বললে বিশ্বাস করবে না, গাছের একটা ছিপছিপে ডাল স'াই করে চাবুকের মতো আমার ওপর পড়ল। তারপর আবার একটা—আবার! লোক নেই, জন নেই—অথচ আমাকে ছিপটি মারছে··· বাপ্‌স!'

হাসতে হাসতে বললুম, 'আপেল গাছটার তোমাকে পছন্দ হয় নি। এস, আমি তোমাকে আমার বন্ধুর বাড়ি নিয়ে যাই। ফল খাইয়ে আনি।'

সন্দিগ্ধ মুখে পা বাড়াল প্রিয়বর্ধন। বলল 'এ দ্বীপে তোমার বন্ধু জুটেছে বুঝি? কিন্তু ঘর বাড়ি বা মানুষজন তো চোখে পড়ল না!'

'এসই না।' বলে কয়েক পা এগিয়ে গেছি, সেই সময় ডান দিকের উঁচু উঁচু গাছগুলোর ভেতর থেকে সেই খ্যান খ্যান চিৎকার জেগে উঠল—'স্টপ্ ইট! স্টপ্ ইট! আই সে—স্টপ ইট!' প্রিয়বর্ধন দাঁড়িয়ে গেল। বলল, 'ওরে বাবা! ওই শোনো কারা ঝগড়া করছে!'

তাকে তখনও খুলে বলিনি, আমরা কিংবদন্তিখ্যাত

কিওটা দ্বীপে আছি। বললে তার প্রতিক্রিয়া কী হবে, বুঝতে পারছিলুম না। কারণ এ দ্বীপে নাকি গুপ্তধন আছে বলে তার বিশ্বাস আছে। ভেবেছিলুম, গুপ্তধনের প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে আমার সঙ্গে তার বন্ধুতা চটে যেতে পারে।

একটু পরে মাঠের মাঝামাঝি গেলে বাঁ দিকের জঙ্গলের ভেতর আজও সেই চাপা গম্ভীর অর্কেস্ট্রার বাজনা বেজে উঠল। প্রিয়বর্ধন খুশিতে নেচে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। 'গির্জায় প্রার্থনাসঙ্গীত হচ্ছে জয়ন্ত! চলো, চলো—আমরা আগে ওখানে যাই!'

ওকে বাধা দিয়ে বললুম, 'প্রিয়বর্ধন! সব কথা তোমাকে বুঝিয়ে বলব। চলো, আগে আমরা কিছু খেয়ে নিই!'

প্রার্থনাসঙ্গীত শুনে প্রিয়বর্ধনের কেমন যেন ঘোর লেগেছে। অস্থির হয়ে বলল, 'আমি একজন খ্রিস্টান, জয়ন্ত। তুমি হিন্দু। ওই প্রার্থনাসঙ্গীতের মর্ম তুমি বুঝবে না। তুমি আমার সঙ্গে যাবে তো এস, আমি চললুম। প্রার্থনায় যোগ না দিলে আমার পাপ হবে।'

এই বলে সে দৌড়ুতে শুরু করল। আমি ওকে ডাকাডাকি করেও ফেরাতে পারলুম না। দেখতে দেখতে সে বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

অগত্যা সেই দয়ালু গাছটার উদ্দেশে এগিয়ে গেলুম। এখনই প্রিয়বর্ধন হন্যে হয়ে ফিরে আসবে।

তাই এল—যখন আমি রসালো পিচ জাতীয় ফল খাচ্ছি। খাচ্ছি মানে ঘাসের ওপর বসে হাঁ করছি, আর একটা করে থোকা আমার মুখে ঢুকছে।

প্রিয়বর্ধনকে দেখে বললুম, 'কী? খুঁজে পেলে গির্জা।'

প্রিয়বর্ধন সে কথার জবাব দিল না। আমার কাণ্ডটা তার চোখে পড়েছিল। সে অবাক হয়ে একটুখানি দেখার পর ধুপ করে বসে পড়ল এবং প্রকাণ্ড হাঁ করল।

মনে হচ্ছিল, আমার দাতা ভদ্রলোকের ভাঁড়ার এবেলাতেই সে উজোড় করে ছাড়বে। এক গাদা ফল গিলে পেটটা ঢাকের মতো ফুলিয়ে বিকট এক ঢেকুর ছেড়ে সে ফিক করে হাসল। বলল, 'জয়ন্ত! আমরা স্বপ্ন দেখছি। তাই না?'...

(ক্রমশঃ)

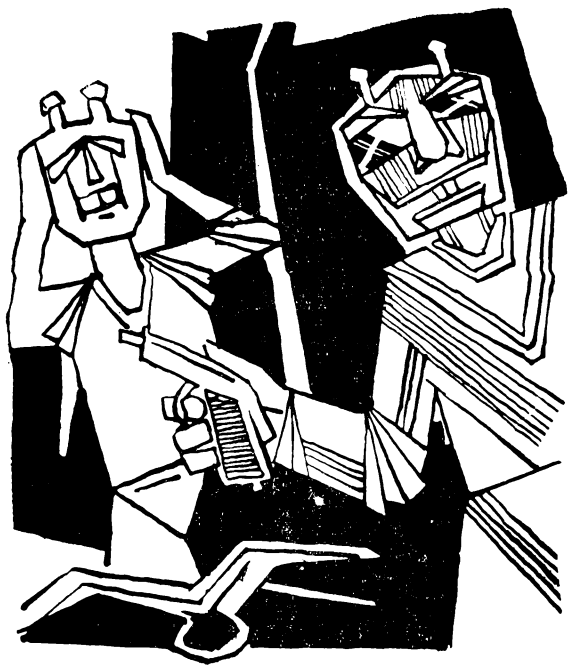

রোবটের পাঠশালা

শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্জন দ্বীপে, এক আছে আট-চালা;
সেইখানে, রোবটের, বসে পাঠশালা।
রোবট ছাত্র সব, রোবটইতো গুরু;
সংকেতে পাঠ দেয়, টান করে ভুরু!
পাঠ-ধরা, পাঠ-বলা অদ্ভুত সেই—
শব্দের সংকেত, বোতাম টিপেই!
গুরুতর পাঠ সেথা, পারেনাকো যে,
গুরু, তারে ছুঁড়ে মারে,—'কসমিক্-রে'!
হেবো বলে,—'আরও জানি, সেইখানে রোজ,—
রোবটেরা কী যে শেখে! পেয়েছি সে খোঁজ!
রোবট-গুরুরই কাছে, ছাত্ররা ঠায়,—
আধুনিক বিজ্ঞানে, উপদেশ পায়!'
আমি ভাবি, এ, হেবোর স্বপ্ন কী, তবে?
কিম্বা কোথাও বটে এরকমই হ'বে!
'সে দ্বীপের নামটা কি? ব'লনারে' হেবো!'
হেবো বলে,—'ভুলে গেছি! পরে, বলে দেবো!!'

65/3, জয়নুদ্দী মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা-700 027

অদ্ভুত পাখী

মানস কুণ্ডু

হঠাৎই আফ্রিকায় যাবার সুযোগ হয়ে গেল। কর্মোপলক্ষ্যে দাদাকে যেতে হবে দক্ষিণ আফ্রিকায়। সঙ্গে একজন যেতে পারে একেবারে ফ্রিতে। সুযোগ ছাড়ি কেন? মাত্র দু'দিনের জন্যে হলেও চলে গেলাম। সখ ছিল 'আফ্রিকার অরণ্য' দেখব। সুযোগ হল ফেরার দিন সকালের দিকে। কিন্তু অরণ্য তেমন গভীর নয়। গভীর অরণ্যে যাওয়া গেল না—অনুমতি নেই, দাদারও অমত। সঙ্গে আমাদের এক প্রবাসী বাঙালী ভদ্রলোক। দারুণ মিশুকে আর আমুদে। উনিই আমাদের অনেকগুলো নতুন নতুন গাছ আর পাখী চিনিয়ে দিলেন। হঠাৎই একটা পাখী দেখিয়ে বললেন 'বলতো ওটা কী পাখী?' এ পাখী আমার চেনা। নিশ্চিন্তে বললাম 'কেন কাঠঠোকরা।' দাদা বলল 'ওটার কাজ নেই নাকি? কাঠ না ঠুকরে লাফালাফি করছে কেন অত?' ভদ্রলোক দাদাকে বললেন 'আপনিও বলছেন এটা কাঠঠোকরা?' দাদা বললো 'হ্যাঁ কাঠঠোকরাই তো!' ভদ্রলোক হাতে গোল্লা বানিয়ে বললেন 'তাহলে দুজনেই গোল্লা পেলেন। পাখীটার পেছন পেছন চলুন একটা নতুন জিনিস দেখবেন।'

আমরা একটু এগোনোর পরেই পাখীটা একটা গাছের ডালে গিয়ে ঝপ করে বসলো। ভদ্রলোক সেই গাছেরই নিচের ডালে একটা ছোটখাট মৌচাকের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বললেন 'ঐ দেখুন পাখীটা আমাদের মৌচাকটার কাছে নিয়ে এল।' দাদা বলল 'পাখীটা নিয়ে এল?' কেন?' ভদ্রলোক কোন কথা না বলে টপাটপ কিছু শুকনো পাতা, কাচাপাতা আর ডাল যোগাড় করে লাইটার দিয়ে চাকের নিচে দিলেন আগুন জ্বালিয়ে। দাদা বলল 'সর্বনাশ আপনার আবার মধু খাওয়ার সখ জাগল নাকি?' ভদ্রলোক বললেন 'দেখুন না কি করি।' পাখীটা ততক্ষণে পাশের গাছের একটা ডালে বসে দেখছে আমাদেরকে। কি দেখছে কে জানে! আমি মজা করার জন্য পাখীটার দিকে তাকিয়ে বললাম 'ওটাকে মধু খাওয়াবেন বোধহয়।' ভদ্রলোক বললেন 'প্রায় তাই'। ততক্ষণে ধূঁয়ো উঠে মৌমাছিগুলোকে গৃহছাড়া করতে শুরু করেছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পড়ে রইল শুধু মধু আর চাক। ভদ্রলোক নিজেই কোনরকমে গাছ থেকে চাকটা পাড়লেন তারপরে টিপে মধু বার করে ফেললেন। মধু বেরোল সামান্যই কিন্তু পড়ল পুরোটাই মাটিতে। আমি

ভাবলাম পাগলাটে ব্যাপার সব, এত কষ্ট এইটুকু মধুর জন্যে তাও মধুটুকু দিলেন কিনা মাটিতে ফেলে।

ভদ্রলোক বললেন 'এবার দেখবেন আসল জিনিস।' বলে চাকটা মাটিতে ফেলে আমাদের নিয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন। অবাক কাণ্ড। দেখলাম পাখিটা উড়ে এসে টুকটুক করে পুরো মৌচাকটাই খেয়ে ফেলল। আমি অবাক হয়ে বললাম 'আরে পাখীটা যে মোমগুলো খেয়ে ফেলল।' ভদ্রলোক বললেন 'এবার বুঝলে তো যে পাখীটা আসলে কাঠঠোকরা নয়। শুধু কাঠঠোকরার মত দেখতে। আসলে এই পাখীগুলোর পেটে ব্যাকটেরিয়া আছে যেগুলো কিনা মোম হজম করিয়ে দেয়। আর পাখীগুলোও শুধু মোম খেয়েও বেঁচে থাকে। সবাইকে পথ দেখিয়ে চাকের কাছে নিয়ে যায়। তারপর মধু সংগ্রহ হয়ে গেলে ফেলে যাওয়া চাকটা খেয়ে নেয় মহা আনন্দে।'

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ হস্টেল, রহড়া, 24-পরগনা।

বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্র : লেখা ও ছবি / দিলীপ দাশ

খুদে বৈজ্ঞানিক

দিলীপ দাস

এই পাথর খনি থেকে তুলে তারপর কেটে-ছুলে হীরের রূপ দেয় জহুরীরা। তখন এর জেল্লা।
এই হীরে খুবই কঠিন পদার্থ। এজন্য হীরে দিয়েই হীরে কাটা হয়, আর কাঁচ কাটতেও ঐ হীরেরই দরকার হয়।
তবে এটা জেনে রাখবি কয়লার মত হীরেও কার্বন অর্থাৎ অঙ্গার। খালি ছ'টোর প্রকৃতি ভিন্ন। দেখি তোর হীরেটা আসল না নকল।
কিন্তু এটা ভীষণ টাইট হয়ে এঁটে আছে!
আর একবার ট্রাই করে দেখ না
দাঁড়া দেখছি
ব্লাপস!
এঃ হে! হাতটা ফসকে লেগে গেল!
রাস্কেল, কার্বন মনোক্সাইড! দেখে খুলতে পারিস্ না?
স্-সরি!
দে তবে, আমি খুলতে পারি কিনা দেখি।
আঃ-আঃ লাগছে!
খুলেছি, হোয়াক!
ফ্লাস-
তুই ওটা নিয়ে নে খুদে। ঐ আংটিটা আমি পঞ্চাশ পয়সা দিয়ে কিনেছিলুম। পরীক্ষা করে ওটা আসল না নকল জানাবি।
!

হাবুলের বিজ্ঞান-ভাবনা

ধীরেন বল

গ্রীষ্মের তারামণ্ডল

বিমান বসু

গ্রীষ্মের আকাশে যে দুটি তারামণ্ডল সহজেই চোখে পড়ে তাদের নাম সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং সিংহরাশি। সপ্তর্ষি মণ্ডলের বিষয় আগেই বলেছি। একে চিনে নেবার সবচেয়ে ভাল সময় হলো বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস যখন একে দেখতে পাবে উত্তর আকাশে দিগন্তের অনেক ওপরে। আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে তাহলে সপ্তর্ষির সব কটি তারাই হয়ত চিনে নিতে পারবে। তারামণ্ডলে 'ভাল্লুক' এর আকৃতিও এসময় সহজে চেনা যায়। সপ্তর্ষিমণ্ডল মধ্যগমন করে 15ই বৈশাখ রাত 10টায় এবং 1লা মাঘ ভোর 4টে নাগাদ।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঠিক দক্ষিণেই রয়েছে সিংহরাশি। সপ্তর্ষিমণ্ডলের 'নির্দেশক' তারা দুটি (পুলহ এবং ক্রতু)-কে ধ্রুবতারার বিপরীত দিকে বাড়িয়ে দিলেই রাশিটিকে দেখতে পাবে। তারামণ্ডলটিতে একটি সিংহের আকৃতির কল্পনা করা হয়েছে যেটা সহজেই চেনা যায়। তবে একে চিনে নেবার আরও সহজ উপায় আছে। সিংহ রাশির উজ্জ্বল তারাগুলিকে দুটি অংশে ভাগ করা যেতে পারে। পশ্চিম অংশের ছ'টি তারা নিয়ে একটি 'কাস্তে'র আকৃতি দেখতে পাবে যার হাতলে রয়েছে একটি উজ্জ্বল তারা, মঘা (প্রভা 1·36)। এদিকটা হলো সিংহের মাথা। তারামণ্ডলের পূর্ব অংশে তিনটি উজ্জ্বল তারা নিয়ে সমকোণি ত্রিভুজটাও সহজেই চোখে পড়ে। এদিকটায় রয়েছে সিংহের লেজের অংশ।

তারামণ্ডলের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা মঘা রয়েছে সিংহের সামনের পায়ের দিকে। এটি একটি চান্দ্র নক্ষত্র। তারামণ্ডলের দ্বিতীয় উজ্জ্বল তারা উত্তরফল্গুণী (প্রভা 1·6)। এর বিদেশী নাম দেনেবোলা (Denebola)। এটিও চান্দ্র নক্ষত্রের একটি। একে দেখতে পাবে সিংহের লেজে। সিংহ রাশিতে যে তৃতীয় চান্দ্র নক্ষত্রটি রয়েছে তার নাম পূর্বফল্গুণী (প্রভা 2·6)। এর বিদেশী নাম জোসমা (Zosma) গ্রীষ্মকালে সিংহরাশিকে দেখা যায় ঠিক মাথার ওপরে। তবে তারামণ্ডলে সিংহের আকৃতিকে চিনতে হলে দক্ষিণ মুখো হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে। সিংহরাশি মধ্যগমন করে 1লা বৈশাখ রাত 9টায় এবং 1লা পৌষ ভোর 5টায়।

সিংহরাশির পূর্ব দিকে যে বড় তারামণ্ডলটিকে দেখতে পাবে তার নাম বুওটিস্ (Bootes)। প্রাচীন কিংবদন্তী অনুসারে তারামণ্ডলটিতে এক পশুচারকের আকৃতির কল্পনা করা হয়েছে। তবে চোখে দেখে সে রকম কিছু বোঝা যায় না। তারামণ্ডলের ছ'টি তারা নিয়ে এক বিশাল লম্বাকার ঘুড়ির আকৃতি চোখে পড়ে যার মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটি রয়েছে ঘুড়ির লেজে। লালচে রং-এর

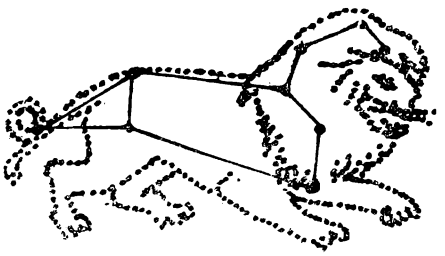

উপরে সিংহ রাশি এবং নীচে কন্যা রাশি

তারাটির নাম স্বাতি, প্রভা— 0.06। এর বিদেশী নাম আর্কটারাস (Arcturus)। তারা হিসেবে স্বাতি খুবই বিশাল। এর ব্যাস সূর্যের ব্যাসের প্রায় 30 গুণ। পৃথিবী থেকে এটি রয়েছে প্রায় 40 আলোকবর্ষ দূরে। মনে রেখ, স্বাতিও চান্দ্র নক্ষত্রগুলির একটি। বুওটিস্ মধ্যগমন করে 1লা আষাঢ় রাত 9টায় এবং 1লা চৈত্র ভোর 3টে নাগাদ।

রাশিচক্রে সিংহের পরে রয়েছে কন্যারাশি। একে দেখতে পাবে সিংহরাশির দক্ষিণপূবে। তারামণ্ডলটিতে মাত্র একটাই উজ্জ্বল তারা রয়েছে যার নাম চিত্রা (প্রভা 1·2)। এর বিদেশী নাম স্পাইকা (Spica)।

আকাশে চিত্রাকে খুঁজে বের করবার একটা সহজ উপায় আছে। প্রথমেই সপ্তর্ষিমণ্ডলের দিকে দেখ। এর তিনটি তারা—অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও মরীচিকে যদি একটা

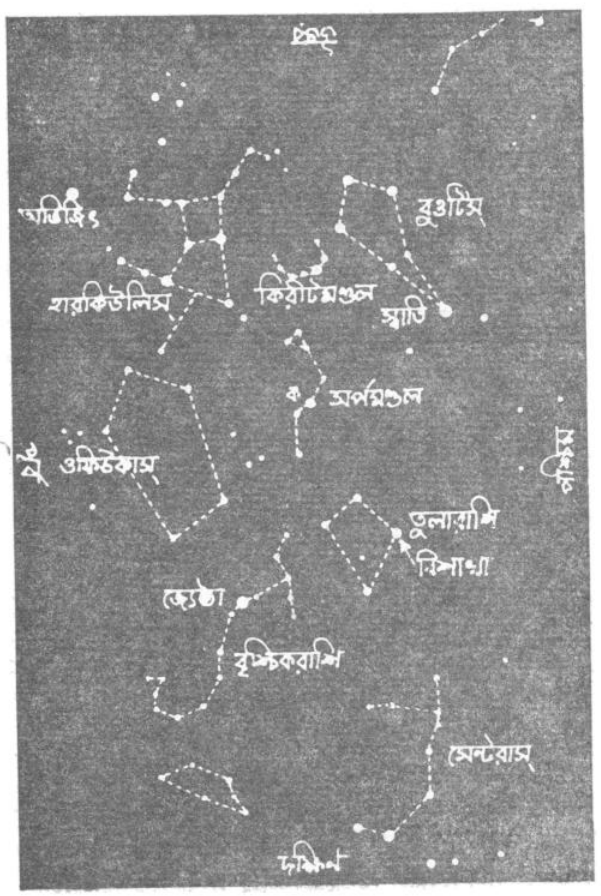

বর্ষার আকাশ

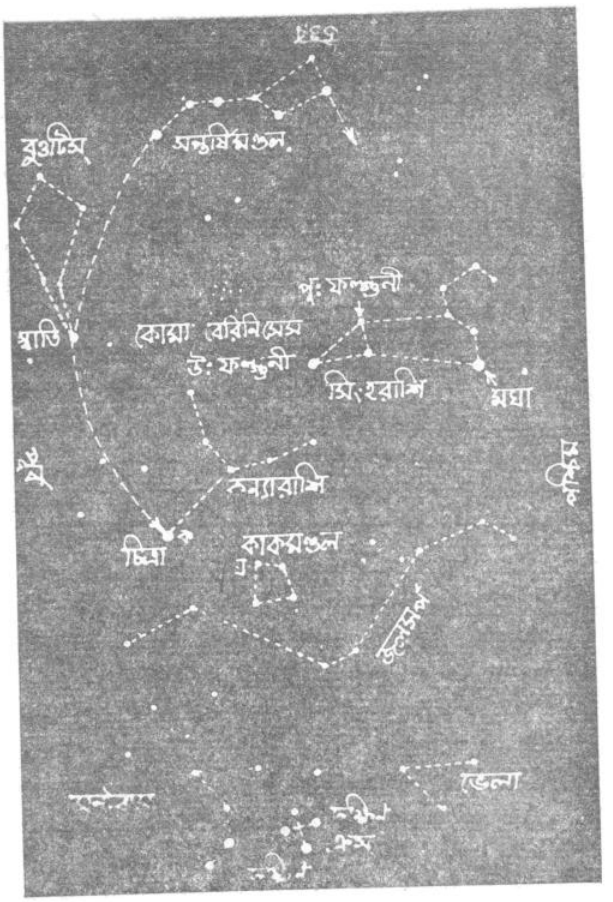

গ্রীষ্মের আকাশ

রেখা দিয়ে জুড়ে দাও তবে একটা বৃত্তচাপের মত রেখা পাবে। ঐ রেখাকে যদি দক্ষিণ-পুব বরাবর বাড়িয়ে দাও তাহলে কিছু দূরে স্বাতি নক্ষত্রে পৌঁছবে। এবার ঐ রেখাকে আরও খানিকটা দক্ষিণ বরাবর বাড়িয়ে দাও তাহলেই চিত্রা তারাটিকে খুঁজে পাবে। ছবিতে ব্যাপারটা বোঝানো হয়েছে। পৃথিবী থেকে চিত্রার দূরত্ব 220 আলোকবর্ষ। এটিও একটি চান্দ্র নক্ষত্র।

চিত্রা ছাড়া কন্যারাশিতে আরও ছ'টি তারা শুধু চোখে দেখা যায়। এদের মধ্যে পাঁচটি তারা এবং চিত্রাকে নিয়ে ইংরেজি—'Y' অক্ষরের আকৃতি সহজেই চোখে পড়ে। কন্যারাশি মধ্যগমন করে 1লা জ্যৈষ্ঠ রাত 9টায় এবং 1লা মাঘ ভোর 5টায়।

এখানে একটা কথা বলে রাখি। একটু লক্ষ্য করলেই

দেখতে পাবে যে চিত্রা, স্বাতি এবং উত্তর ফল্গুণী এক বিশাল সমবাহু ত্রিভুজের তিন কোণে রয়েছে। ঐ বিশাল ত্রিভুজকে "গ্রীষ্মের ত্রিভুজ" বা Summer Triangle-ও বলা হয়।

কন্যারাশির ঠিক দক্ষিণে রয়েছে চারটি তারার একটি ছোট চতুর্ভুজ। তারামণ্ডলটির নাম কাকমণ্ডল বা কর্ভাস (Corvus)। এর সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটি তৃতীয় প্রভার। কিন্তু সেজন্য তারামণ্ডলটিকে চিনে নিতে কোনও অসুবিধে হয় না। কাকমণ্ডলকে কেউ কেউ হস্তা বলেই অভিহিত করেন। কিন্তু আসলে তারামণ্ডলের 'ঘ' তারাটিই হলো চান্দ্র নক্ষত্র হস্তা। কাকমণ্ডল মধ্যগমন করে 1লা জ্যৈষ্ঠ রাত 9টা নাগাদ এবং 1লা মাঘ ভোর 5টা নাগাদ।

কাকমণ্ডলের দক্ষিণে জলসর্প তারামণ্ডলের বাকি অংশটুকু দেখতে পাবে। তারামণ্ডলটির বিষয় আগেই বলেছি; এবং পূর্ব প্রান্তটি রয়েছে কাকমণ্ডলের দক্ষিণ পূবে।

কাকমণ্ডলের সুদূর দক্ষিণে রয়েছে সুন্দর একটি তারামণ্ডল যার নাম দক্ষিণ ক্রস বা Southern Cross। তারামণ্ডলটিতে প্রথম প্রভার একটি এবং দ্বিতীয় প্রভার দুটি তারা রয়েছে যাদের নিয়ে ক্রসের আকৃতির ছোট্ট তারামণ্ডলটিকে সহজেই চেনা যায়। অবশ্য দক্ষিণ খ-মেরুর খুব কাছে রয়েছে বলে কলকাতা বা উত্তর ভারতের কোনও স্থান থেকে একে দেখতে পাওয়া যায় না। কেবল মাত্র দক্ষিণ ভারত থেকেই একে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ ক্রস মধ্যগমন করে 1লা জ্যৈষ্ঠ রাত 9টায় এবং 1লা মাঘ ভোর 5টা নাগাদ।

দক্ষিণ আকাশের আর একটি উজ্জ্বল তারামণ্ডল সেণ্টরাস্ (Centaurus)-কে দেখতে পাবে দক্ষিণ ক্রসের ঠিক পূবে। এ তারামণ্ডলটিতেও বেশ কয়েকটি উজ্জ্বল তারা রয়েছে। তাদের মধ্যে দুটি প্রথম প্রভার তারা। এ তারামণ্ডলটিকেও কেবলমাত্র দক্ষিণ ভারত থেকেই দেখতে পাওয়া যায়।

সেণ্টরাসের সর্বোজ্জ্বল তারাটির নাম আলফা সেণ্টরাই (Alpha Centauri), প্রভা—0·27। সূর্যকে বাদ দিলে এটি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের তারা, দূরত্ব মাত্র 4·3 আলোকবর্ষ। তারামণ্ডলের দ্বিতীয় উজ্জ্বল তারাটির নাম হাদার (Hadar), প্রভা 0·63। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব 490 আলোকবর্ষ।

যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে তাহলে সিংহ রাশি ও বুওটিস্ তারামণ্ডলের মাঝখানে একটা খুবই ছোট তারামণ্ডলের হয়ত দেখতে পাবে। নাম কোমা বেরিনিসেস্ (Coma Berenices)। তারামণ্ডলটিকে শুধু চোখে কেবলমাত্র হাল্কা আলোর ছোপের মতই দেখায় কারণ এতে চতুর্থ প্রভার চেয়ে উজ্জ্বল তারা নেই। কিন্তু বাইনোকুলারে এক ঝাঁক তারা দেখতে পাওয়া যায়। বড় দূরবিনে বেশ কয়েকটা গ্যালাক্সিও চোখে পড়ে। দৃষ্টি শক্তি প্রখর না হলে অবশ্য তারামণ্ডলটিকে শুধু চোখে খুঁজে বের করা সোজা নয়।

গ্রীষ্মের পরের ঋতু বর্ষা। আমাদের দেশে আষাঢ়-শ্রাবণ এই দুই মাসই বর্ষার মাস বলে ধরা হয়। বুঝতেই পারছ এসময় বেশীর ভাগ সময়ই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে। রাতের আকাশে তারা দেখা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু যদি এক পশলা বৃষ্টির পর মেঘ কেটে যায় তবে আকাশ অদ্ভুত স্বচ্ছ দেখায়। সে সময় বেশ কয়েকটি সুন্দর তারামণ্ডল দেখতে পাবে।

বর্ষার আকাশে যে তারামণ্ডলটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটা হলো বৃশ্চিকরাশি বা স্কর্পিয়াস (Scorpius)। এটি রাশিচক্রের তারামণ্ডলগুলির একটি। একে দেখতে পাবে, দক্ষিণ আকাশে বিশাল এক বিছের মত। নামের সঙ্গে তারামণ্ডলের আকৃতির এত সাদৃশ্য অন্য কোনও তারামণ্ডলে দেখা যায় না।

বৃশ্চিক রাশিতে একটিই প্রথম প্রভার তারা রয়েছে, নাম জ্যেষ্ঠা। উজ্জ্বল লালচে হলদে রং এর এ তারাটির বিদেশী নাম অ্যান্টারেস্ (Antares), প্রভা 0.98। জ্যেষ্ঠাকে আকাশে খুঁজে বের করা মোটেই কঠিন নয়।

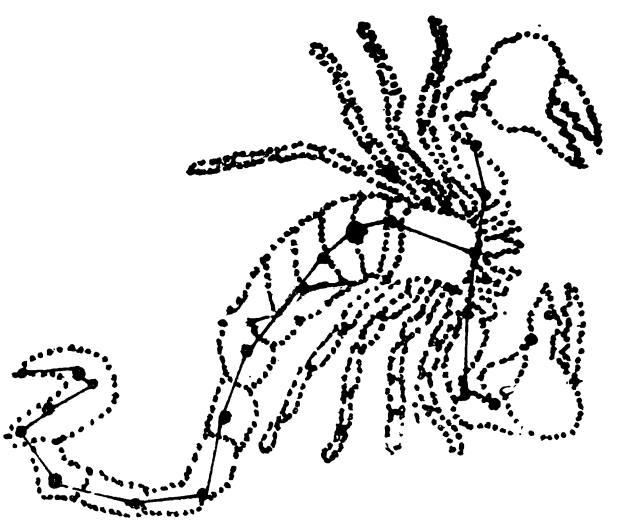

বৃশ্চিক রাশি

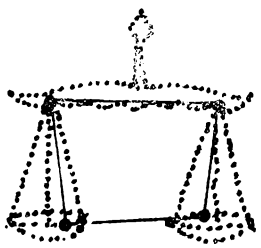

তুলা রাশি

যদি সহজে খুঁজে না পাও তবে হারকিউলিস্ তারামণ্ডলকে মাথার ওপরে রেখে (আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহে রাত 10টা নাগাদ) দক্ষিণ দিগন্তের খানিকটা ওপরে দেখ তাহলেই একে খুঁজে পাবে। আবার মঘা এবং চিত্রাকে যোগ করে সেই সরল রেখাটিকে যদি দক্ষিণ পূব বরাবর বাড়িয়ে দাও তাহলেও জ্যেষ্ঠাকে খুঁজে পাবে।

আয়তনে জ্যেষ্ঠা বিশাল। এর ব্যাস 56 কোটি 30 লক্ষ কিলোমিটার, মানে আমাদের সূর্যের ব্যাসের প্রায় 40 গুণ। পৃথিবী থেকে জ্যেষ্ঠার দূরত্ব 520 আলোকবর্ষ। জ্যেষ্ঠাও চান্দ্র নক্ষত্র গুলির একটি। এটি মধ্যগমন করে 1লা শ্রাবন রাত 9টা নাগাদ এবং 1লা বৈশাখ ভোর ওঠে নাগাদ।

একবার যদি জেষ্ঠাকে ভাল করে চিনে নাও তাহলে তারামণ্ডলের বাকি তারাগুলিকেও সহজেই চিনে নিতে পারবে। শ্রাবণ মাসে আকাশ যদি মেঘশূন্য থাকে তাহলে প্রায় সারা রাত ধরে দক্ষিণ আকাশে বৃশ্চিক রাশিকে দেখতে পাবে।

কন্যা ও বৃশ্চিক রাশির ঠিক মাঝখানে রয়েছে তুলা-রাশি, যার বিদেশী নাম লাইব্রা (Libra)। তারামণ্ডলটি খুবই ছোট এবং এতে তৃতীয় প্রভার চেয়ে উজ্জ্বল কোনও তারা নেই। সহজে যদি খুঁজে না পাও তবে বৃশ্চিকের 'দাড়া'র উত্তর পশ্চিমে একটু লক্ষ করে দেখ, চারটি তারার চতুর্ভুজটি হয়ত চোখে পড়বে। তারামণ্ডলটিতে একটি দাড়ি পাল্লার আকৃতির কল্পনা করা হয়েছে। তুলা'র ক-তারাটি একটি চান্দ্র নক্ষত্র, নাম বিশাখা। তুলারাশি মধ্যগমন করে 1লা আষাঢ় রাত 9টায় এবং 1লা ফাল্গুন ভোর 5টা নাগাদ।

আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে বুত্তটিস তারামণ্ডলকে দেখা যায় প্রায় মাথার ওপরেই। এ সময় তারামণ্ডলটির ঠিক পূব-দিকে দেখতে পাবে সাতটি তারা নিয়ে অর্দ্ধবৃত্তাকার ছোট একটি তারামণ্ডল, নাম কিরীটমণ্ডল বা করোনা বোরিয়েলিস্ (Corona Borealis)। তারামণ্ডলটি ছোট কিন্তু খুবই সুন্দর দেখতে। এর সর্বোজ্জ্বল তারাটি দ্বিতীয় প্রভার। কিরীট মণ্ডল মধ্যগমন করে 15ই আষাঢ় রাত 9টায় এবং 15ই চৈত্র ভোর তিনটে নাগাদ।

সর্পমণ্ডলের বিষয় আগে বলেছি। তারামণ্ডলটি রয়েছে দু'টি ভাগে। এর অর্দ্ধেকটাকে দেখা যায় ওফিউকাস্ তারামণ্ডলের পূব দিকে। সেটা হলো সাপের লেজের দিকটা। বাকি অর্দ্ধেকটাকে দেখতে পারে কিরীটমণ্ডলের দক্ষিণে, ওফিউকাস্ মণ্ডলের পশ্চিমে। তারামণ্ডলের এই অংশে তিনটে ছোট তারার যে ত্রিভুজটি দেখা যায় সেটাই হলো সর্পমণ্ডলের সাপের মাথা। তারামণ্ডলের সর্বোজ্জ্বল তারাটিকেও (ক-তারা) দেখতে পাবে এই অংশে। এটি তৃতীয় প্রভার তারা।

এতক্ষণ তোমাদের আকাশের বিভিন্ন তারামণ্ডলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। হয়ত ইতি মধ্যেই তোমরা অনেকে বেশ কয়েকটিকে ভাল করে চিনে নিতে পেরেছ। আশা করবো আকাশ ভরা তারা দেখে আর তোমরা অবাক হবে না। তাদের অনেককেই নিজের বন্ধুর মত চিনে নিতে পারবে।

7/UF. কলেজ রোড, নয়া দিল্লী-1

বিজ্ঞপ্তি

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান মে'৮৪ তে চার বছরে পদার্পণ করছে। কাগজ, মুদ্রণ এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য খরচ অত্যাধিক বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য নতুন বছরের শুরুতে পত্রিকার দাম আড়াই টাকা থেকে বেড়ে তিন টাকা করতে হচ্ছে। আশাকরি সহৃদয় পাঠক, ক্রেতা সাধারণ আমাদের অনুরোধ মেনে নেবেন। শুধু 50 পয়সা দাম বাড়ছে না—নতুন বছরের গোড়াতেই আমরা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আরো নতুন ভাবে সাজাবার চেষ্টা করছি।

—প্রকাশক

মানবদেহ

সুবীর কুমার দাস.

বিজ্ঞানে আজ মানুষের জয় জয়কার। মানুষ আজ ভয়েজার, পাইওনীয়ারের মত মহাকাশযান মহাশূন্যে প্রেরণ করছে, বহু দুরারোগ্য ব্যাধিকে জয় করছে, বিভিন্ন উন্নত মানের কম্পিউটারের সাহায্যে নানা রকম জটিল অঙ্কের হিসেব কয়েক মুহূর্তে বের করে ফেলছে—দিকে দিকে বিজ্ঞানের জয়ে মানুষ আজ বিস্মিত, অভিভূত। এত চেষ্টা করে, উন্নতির সবচেয়ে উঁচু ধাপে উঠেও কিন্তু আজ মানুষ এমন একটা যন্ত্র তৈরী করতে পারে নি যার সঙ্গে মানবদেহের কোনও তুলনা চলে। মানুষ নিজেই এক অতুলনীয় আশ্চর্য যন্ত্র।

একজন সাধারণ মানুষের শরীর $10^{৪৪}$ সংখ্যক কোষ দ্বারা গঠিত। মানুষের চোখ এক বিস্ময়কর অঙ্গ। 130 লক্ষ দন্ড এবং 7 লক্ষ শঙ্কু কোষ দ্বারা এই চোখ গঠিত। চোখ তিন লক্ষ স্নায়ুকোষের সাহায্যে মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত। যদি মানুষের চোখের বিকল্প যন্ত্র তৈরীর কথা কেউ ভাবেন তবে দরকার হবে আজই লক্ষ টি. ভি.-এর গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্রের।

আমাদের কান দুটোও কম বিস্ময়কর নয়। পিয়ানোর সাথে আমাদের কানের তুলনা করলে দেখা যায়, যেখানে পিয়ানোতে চাবির সংখ্যা 88, সেখানে আমাদের কানের চাবির সংখ্যা পনেরো হাজার। আমাদের কানের অনুভব ক্ষমতা এত বেশী যে পিয়ানোর দুই চাবির মাঝে 10 টি পর্যন্ত শব্দ তুলতে পারে।

আমাদের দেহে 639 টি পেশী আছে। প্রতি বর্গ ইঞ্চি পেশী 56 থেকে 140 পাউণ্ড পর্যন্ত ওজন তুলতে পারে। আমাদের হাত 27টি হাড় ও 19টি গোটা মাসলের সাহায্যে সহজভাবে গঠিত। বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত এমন কোনও কর্মঠ যন্ত্র তৈরী করতে পারেন নি যা হাতের মত এত সক্রিয়।

এখন পর্যন্ত যা বলা হল তা সবই শরীরের বাইরের অঙ্গ। শরীরের আভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলির কাজ করবার ক্ষমতা শুনলে আরও অবাক হতে হয়।

একজন স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের দেহে 5 থেকে 6 লিটার রক্ত থাকে। এই রক্তের ওজন মানুষের শরীরের ওজনের প্রায় $\frac{1}{13}$ অংশ। আমাদের দেহের যে সমস্ত নালী দিয়ে রক্ত চলাচল করে সেই সমস্ত রক্তবাহী নালী যদি পরপর যোগ করা যায় তাহলে তা দৈর্ঘ্যে প্রায় এক লক্ষ মাইল হবে। আমাদের দেহে রক্ত প্রতিটি চক্র (cycle) ঘুরে আসতে সময় নেয় 23 সেকেণ্ড এবং রক্তকে প্রতিদিন এরকম 3700 টি চক্র ঘুরতে হয়। হিসেব করে দেখা গেছে প্রতিদিন রক্ত আমাদের শরীরে ভ্রমন করছে প্রায় 16 800 0000 মাইল পথ। একজন স্বাভাবিক মানুষের দুটি কিড্‌নীর ওজন আর শরীরের ওজনের $\frac{1}{২৫০}$ অংশ। এই কিড্‌নী দুটি প্রতিদিন 200 লিটার রক্ত পরিষ্কার করে এবং প্রতি মিনিটে এক মিলি লিটার মূত্র উৎপন্ন করে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মূত্রাশয়ে 300 মিলিলিটার পর্যন্ত মূত্র জমা হতে পারে।

আমাদের হৃৎপিণ্ডটি দেখতে অনেকটা মাথা কাটা মোচার মত। এর অবস্থান আমাদের বুকের প্রায় মাঝখানে, একটু বাঁদিক ঘেঁষে। হৃৎপিণ্ডের দুপাশে আছে দুটি ফুসফুস। এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা এমন কোনও পাম্প তৈরী করতে পারেন নি যা মানবদেহের হৃৎপিণ্ডের সংগে পাল্লা দিতে পারে। আমাদের হৃৎপিণ্ড প্রতি ঘণ্টায় 60 থেকে 70 গ্যালন রক্ত পাম্প করে। দৈনিক হৃৎস্পন্দনের সংখ্যা এক লক্ষ বার। আমরা দিনে শ্বাস নিচ্ছি 23040 বার।

এখন, শরীরের যে অংশ বিজ্ঞানীদের কাছে এখনও কুহেলিকায় আচ্ছন্ন সেই মস্তিষ্কের কথা ধরা যাক। মস্তিষ্কের ওজন প্রায় দেড় কিলোগ্রাম। উপর থেকে মস্তিষ্ককে দেখলে ধূসর দেখায়—আখরোটের মতোই কোঁচ-কানো। আমাদের মগজের স্নায়ুকোষের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার কোটি। প্রতিটি স্নায়ুকোষ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র—দৈর্ঘ্যে এক ইঞ্চির দুই হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। কিন্তু

এদের কর্মক্ষমতা অদ্ভুত। এক একটি স্নায়ুকোষ আর উত্তেজনা প্রবাহকে একশটি স্নায়ুকোষের মধ্যে চালান করে দিতে পারে। প্রত্যেকটি কোষ এক ভোল্টের দশভাগের এক ভাগ শক্তিতে কাজ করে। যদি মানুষের মগজের অনুরূপ একটি কম্পিউটার তৈরী করা সম্ভব হত, তবে তার আয়তন এতই বড় হত যে, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অট্টালিকাটাই লেগে যেত তার স্থান সংকুলানের জন্য এবং পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তার সবটাই লেগে যেত এর প্রয়োজন মেটাবার জন্য। মানুষের মগজের তথ্য ধারনের ক্ষমতাও অসাধারণ (1013 সংখ্যকের মতো) অর্থাৎ, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় লাইব্রেরীর জ্ঞানভাণ্ডারের সবটাই জায়গা করে নিতে পারে ঐ দেড় কে. জি. ওজনের মস্তিষ্কে।

গ্যাব্রিয়েল বার্টরাণ্ড নামে একজন ফরাসী জীব রসায়ন বৈজ্ঞানী 100 কিলোগ্রাম ওজনের একজন মানুষের দেহে কোন্ কোন্ পদার্থ কি পরিমাণে আছে তার একটা হিসেব দিয়েছেন। হিসেবটি নীচে দেওয়া হল।

পদার্থ	পদার্থের পরিমাণ
অক্সিজেন	63 Kg.
কার্বন	19
হাইড্রোজেন	9
নাইট্রোজেন	5
ক্যালসিয়াম	1 „
ফসফরাস	700 Gm.
সালফার	640 „
সোডিয়াম	260
পটাসিয়াম	220
ক্লোরিণ	180
ম্যাগনেসিয়াম	40
আয়রণ	3
আয়োডিন	0·03 „

এছাড়া মানবদেহে সামান্য পরিমাণে ফ্লুরিণ, ব্রোমিন, ম্যাঙ্গানীজ এবং কপার বিদ্যমান।

107, উল্টাডাঙা মেন রোড, (LIGH—1) সি. আই. টি. বিল্ডিংস, ব্লক—4, ফ্ল্যাট—34, কলি-67

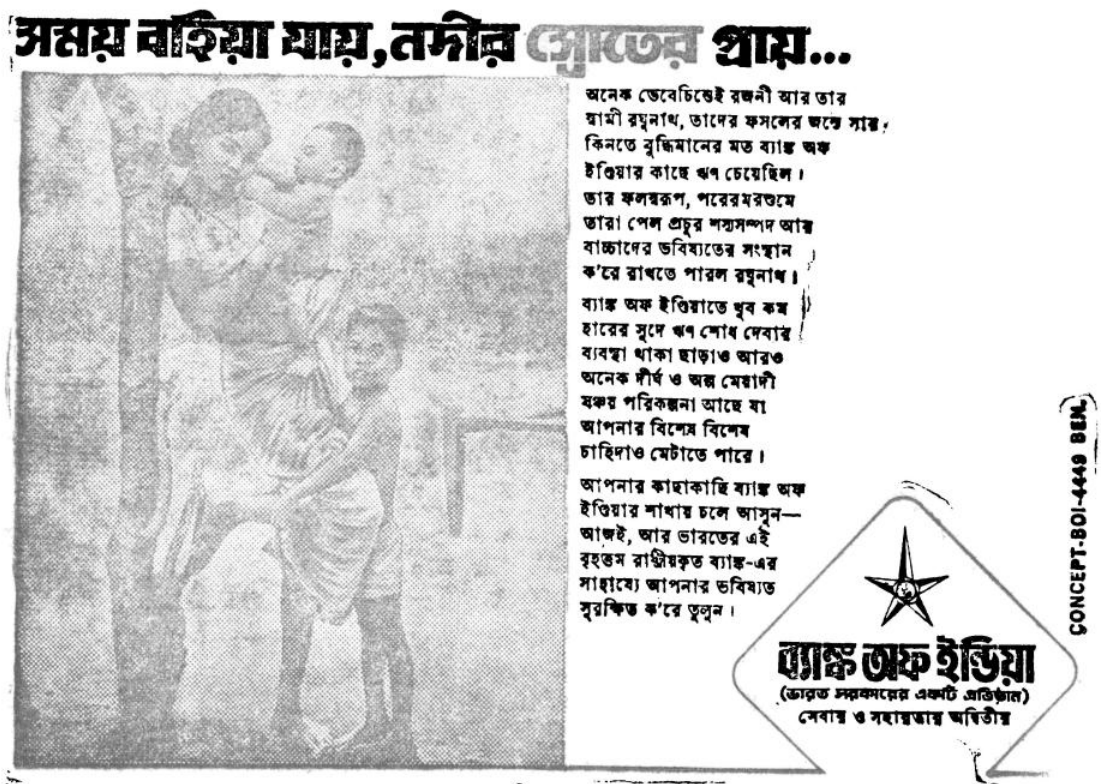

পদার্থবিদ্যা

অলক চক্রবর্তী

শব্দ-বিজ্ঞানের ছোট প্রশ্ন, ছোট উত্তর নিয়ে এবার আমাদের আলোচনা হবে। মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম ঘিরে আমাদের আলোচনা—সেটা তোমরা আগেই জানো, তাই পাঠক্রমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রশ্নোত্তর তৈরী করা হয়েছে।

প্রশ্ন 1 : (i) আলো ও শব্দের প্রতিফলনে কোন তফাৎ আছে কি?

(ii) শব্দের প্রতিফলনের নিয়মগুলো কি কি?

উত্তর 1 : শব্দ ও আলোর প্রতিফলনে মৌলিক কোন তফাৎ নেই। দুটোর জন্যেই একই নিয়ম খাটে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুব কম (6×10^{-5} cm ক্রমের) বলে আলোর প্রতিফলক তল খুব মসৃণ হওয়া দরকার।

শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য আলোর থেকে অনেক বড়ো। ঠিক মতো প্রতিফলন হয় যখন প্রতিফলকের পরিসর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের দশগুণ বা তারও বেশী হয়।

শব্দ প্রতিফলনের জন্যে লম্বায়, চওড়ায় বড়ো এমন একটা প্রতিফলক দরকার। এটা খুব মসৃণ না হলেও চলবে। কাঠের দেওয়াল, ইঁটের দেওয়াল প্রভৃতি থেকে শব্দ প্রতিফলিত হয়।

সরু আলোর রশ্মি তৈরী করা ও প্রতিফলিত কিরণ দেখা যতো সহজ, সরু শব্দ-রশ্মি সৃষ্টি করা ও প্রতিফলিত রশ্মির ঠিক দিক নির্ণয় করা বেশ কঠিন। তাই শব্দের প্রতিফলন আলোর প্রতিফলনের মতো সহজে দেখান যায় না।

শব্দ ও আলোকের প্রতিফলনের সূত্র একই প্রতি-ফলনের নিয়ম—

(i) আপতিত শব্দরশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি ও আপতন বিন্দুতে প্রতিফলকের ওপর টানা লম্ব একই সমতলে থাকে।

(ii) আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ সমান।

প্রশ্ন 2 : (i) গীটারের তারের দৈর্ঘ্য ছোট করলে উৎপন্ন শব্দের তীক্ষ্ণতা বাড়ে কেন?

(ii) একটা ট্রেন বাঁশি বাজাতে বাজাতে যতই স্টেশনের কাছে যেতে থাকে তত জোরে শব্দ শোনা যায় কেন?

উত্তর 2 : (i) তারের কাঁপার জন্যে যে শব্দ সৃষ্টি হয়, তার কম্পাঙ্ক তারের দৈর্ঘ্যের ব্যস্তানুপাতিক হয়। তাই গীটারের তারের দৈর্ঘ্য কমালে উৎপন্ন শব্দের কম্পাঙ্ক বাড়ে। তাই শব্দের তীক্ষ্ণতাও বাড়ে।

(ii) শব্দের উৎস ও শ্রোতার মাঝের দূরত্ব কমলে বেশী পরিমাণ শব্দ শক্তি শ্রোতার কানে এসে পৌঁছোয়। যখন একটা ট্রেন বাঁশি বাজাতে বাজাতে স্টেশনের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে ততই স্টেশনের সঙ্গে তার দূরত্ব কমতে থাকে এবং শব্দের প্রাবল্য ক্রমে বেড়ে যায়। এর ফলে স্টেশন থেকে এই শব্দটা খুব জোরে শোনা যায়।

প্রশ্ন 3 : (i) তারের কম্পনে,

(ii) বায়ুস্তম্ভের কম্পনে,

(iii) চামড়ার পর্দার কম্পনে শব্দ হয় এমন তিনটে করে বাজনার নাম লেখ।

উত্তর 3 : সেতার, বেহালা ও এস্রাজে তারের কম্পনে আওয়াজ হয়।

(ii) বাঁশি, সানাই ও হারমোনিয়ামে বায়ুস্তম্ভের কম্পনে আওয়াজ হয়।

(iii) ঢাক, বংগো, ও তবলায় চামড়ার পর্দার কম্পনে আওয়াজ হয়।

প্রশ্ন 4 : কাচের ছোট শিশিতে ফুঁ দিলে জোর আওয়াজ বের হয় কেন যেখানে বোতলে ফুঁ দিলে হয় না?

উত্তর 4 : ফুঁ দিলে কাচের ছোট শিশির ভেতরকার বায়ুস্তম্ভের কম্পন হয় ও শব্দ বের হয়। বোতলের থেকে ঐ শিশি অনেক ছোট, তাই সেক্ষেত্রে কম্পাঙ্কও বেশী হয়, ফলে তীক্ষ্ণতাও বেশী হয়।

প্রশ্ন 5 : লম্বা ও ফাঁপা লোহার নলের একদিকে শব্দ করলে অন্য ধারে দুটো আলাদা শব্দ শোনা যায় কেন?

উত্তর 5 : নানারকম মাধ্যমে শব্দের বেগ নানারকম। $0^{\circ}C$ উষ্ণতায় বায়ুতে শব্দের বেগ 322 মিটার / সেকেণ্ড ও লোহাতে 5130 মিটার / সেকেণ্ড।

লোহার নলের একধারে শব্দ সৃষ্টি করলে শব্দ বাতাসের ভেতর দিয়ে ও লোহার ভেতর দিয়ে অন্য ধারে পৌঁছোয়। লোহার ভেতর দিয়ে যে শব্দ যায়, তার বেগ বেশী বলে ওটা আগে পৌঁছোয় ও ওর তীব্রতাও বেশী হয় এবং বাতাসের ভেতর দিয়ে যে শব্দ যায় ওটা পরে গিয়ে পৌঁছয় এবং ওর তীব্রতাও কম হয়। তাই নলের অন্যধারে প্রথমে একটা জোরালো ও পরে একটা ক্ষীণ শব্দ শোনা যায়।

প্রশ্ন 6 ঃ চাঁদে কোন বিস্ফোরণ হলে সেই শব্দ আমরা শুনতে পাব কি ? কেন ?

উত্তর 6 ঃ না, চাঁদে কোন বিস্ফোরণ হলে সেই শব্দ আমরা শুনতে পাব না। কারণ চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যে বায়ুশূন্য স্থান আছে, যার জন্যে ঐ শব্দ পৃথিবীতে আসতে পারবে না, কারণ শব্দ বিস্তারের জন্যে জড় মাধ্যমের দরকার।

প্রশ্ন 7 ঃ "অন্ধকার ঘরে কোন খালি কলসীতে জল ঢাললে শব্দ শুনে বোঝা যায় যে কলসীটা জলে ভর্ত্তি হয়েছে।" কারণ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর 7 ঃ বায়ুস্তম্ভের কম্পন (তথা কম্পাঙ্ক বা তীক্ষ্ণতা) দৈর্ঘ্যের ব্যস্তানুপাতিক। শূণ্য কলসীতে জল ঢালার সময় কলসীর ভেতরের বাতাসের কম্পনের সৃষ্টি হয় ও শব্দ শোনা যায়। কলসীটা যত জলে ভর্ত্তি হয়ে আসবে, বায়ুস্তম্ভের দৈর্ঘ্যও তত কমে আসবে ও শব্দের কম্পাঙ্ক বেশী হবে। এইরকম হতে হতে যখন কলসীটা পুরো ভর্ত্তি হবে, তখন শব্দের কম্পাঙ্ক তথা তীক্ষ্ণতা স্থির হয়ে যাবে এবং বোঝা যাবে যে কলসীটা জলে ভর্ত্তি হয়েছে।

প্রশ্ন 8 ঃ মানুষের স্বরযন্ত্র থেকে কি করে শব্দ বের হয় ? ছেলেদের গলার থেকে মেয়েদের গলা বেশী তীক্ষ্ণ হয় কেন ?

উত্তর 8 ঃ মানুষের স্বরযন্ত্রে দুটো পাতলা পর্দা থাকে যার মধ্যে ফাঁক খুব কম থাকে। ফুসফুস থেকে বাতাস যখন খুব জোরে ঐ ফাঁক দিয়ে বাইরে আসে, তখন পর্দা দুটো কাঁপতে থাকে। এই কাঁপার ফলে শব্দ বের হয়।

ছেলেদের গলার স্বরের কম্পাঙ্কের চেয়ে মেয়েদের গলার শব্দের কম্পাঙ্ক অনেক বেশী। এইজন্যে ছেলেদের গলার থেকে মেয়েদের গলা বেশী তীক্ষ্ণ হয়।

প্রশ্ন 9 ঃ দূর থেকে আসা ট্রেনের আওয়াজ রেললাইনে কান পাতলে পরিষ্কার শোনা যায় কিন্তু বাতাসে শোনা যায় না কেন ?

উত্তর 9 ঃ শব্দের গ্যাস মাধ্যমের চেয়ে কঠিন মাধ্যমে অনেক বেশী। এইজন্যে ট্রেনের আওয়াজ বায়ুর থেকে রেল লাইনে কান পাতলে বেশী পরিষ্কার শোনা যাবে।

জয়পুরিয়া কলেজ, কলকাতা

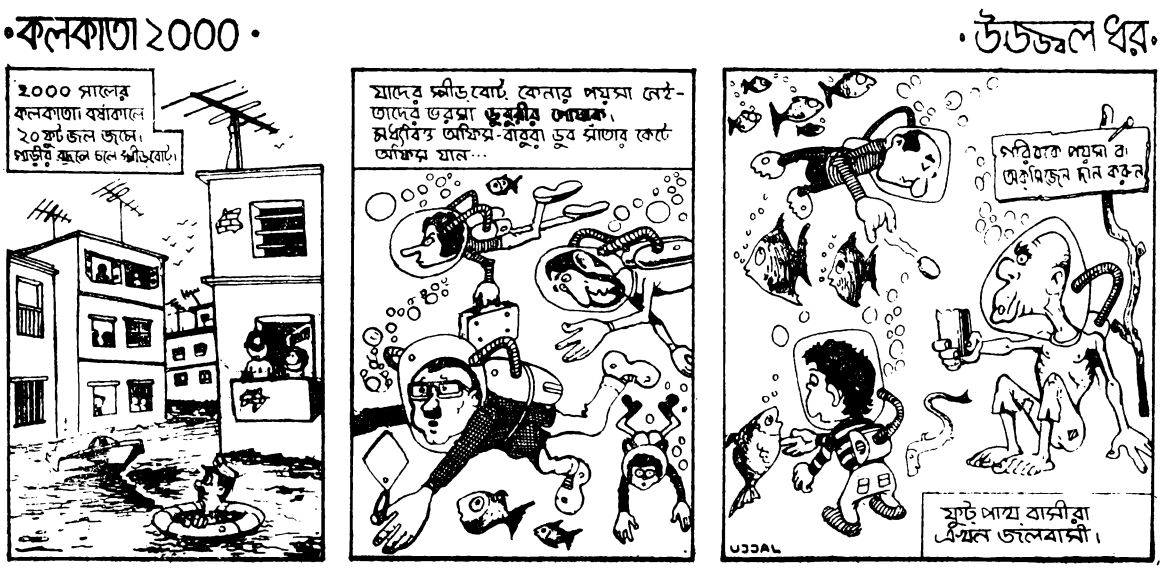

গৃহ নির্মাণের উপাদানঃ সিমেণ্ট

অমরনাথ রায়

গৃহ নির্মাণের প্রধান উপাদানগুলির মধ্যে 'সিমেণ্ট' অন্যতম। যে সিমেণ্ট আমরা ব্যবহার করে থাকি, তা 'পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট' নামেই বেশী পরিচিত। 'যোসেফ আস্পদিন নামে একজন রাজমিস্ত্রী 1824 খ্রীষ্টাব্দে কাদা-মাটি ও চুনাপাথর উত্তপ্ত করে কৃত্রিম উপায়ে যে সিমেণ্ট প্রস্তুত করেন, তাই 'পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট' নামে পরিচিত। তখনকার দিনে ইংলণ্ডের 'পোর্টল্যাণ্ড' নামক স্থানে গৃহ নির্মাণের যে পাথর পাওয়া যেতো তার বহুল ব্যবহার ছিল। ঐ পাথরের রঙের সঙ্গে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত সিমেণ্টের রঙের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে 'যোসেফ আস্পদিন' তাঁর আবিষ্কৃত সিমেণ্টের নাম রাখেন 'পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট।

'পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট' মূলতঃ সিলিকন, ক্যালসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম ও লোহার বিভিন্ন যৌগের মিশ্রণ। এই সব মৌলের অক্সাইড যৌগগুলি সিমেণ্ট উৎপাদন প্রণালীর সময় পারস্পরিক রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে কতকগুলি নতুন যৌগ গঠন করে। সূক্ষ্ম চূর্ণ অবস্থায় সিমেণ্টকে যখন বাস্তবে ব্যবহার করা হয় তখন ঐ যৌগগুলি জলের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে আর এক শ্রেণীর যৌগ গঠন করে—যারা জমাট বাঁধবার সময় অধিকতর সুদৃঢ় হ'য়ে নির্দিষ্ট কাঠিন্য লাভ করে। আজকাল সিমেণ্টের ধর্মের উৎকর্ষ সাধনের জন্যে তাতে শতকরা দুই থেকে পাঁচ ভাগ 'জিপসাম' (সোদক ক্যালসিয়াম সালফেট) মেশানো হয়।

সিমেণ্টের পণ্যোৎপাদনের জন্যে যে সব কাঁচা মাল লাগে সেগুলি হলো (i) চুনাপাথর (ii) বালি (iii) কাদামাটি (iv) লোহার আকরিক অথবা 'মিল স্কেল'। চুনা পাথর, অর্থাৎ কিনা ক্যালসিয়াম কার্বনেট থেকে পাওয়া যায় ক্যালসিয়াম অক্সাইড। বালি হলো 'সিলিকা' বা সিলিকন ডাই অক্সাইড। এতে কিছু অবিশুদ্ধি মিশ্রিত থাকে। কাদামাটি অনেক রকমের হতে পারে।

এ জিনিসটি অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড বা অ্যালুমিনার উৎস। লোহার আকরিক অথবা 'মিল স্কেল' থেকে পাওয়া যায় ফেরিক অক্সাইড। পণ্যোৎপাদনের আগে রসায়নবিদেরা এই কাঁচা মালগুলি উপযুক্ত মানের কিনা তা পরীক্ষা করে দেখেন। ব্লাস্ট ফার্নেস বা মারুত চুল্লীজাত ধাতু মলও (স্ল্যাগ) আজকাল সিমেণ্ট উৎপাদনে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তবে এই ধাতু মলও উপযুক্ত মানের হওয়া চাই। তাতে সিলিকা শতকরা 27 থেকে 32 ভাগ, 'অ্যালুমিনা' শতকরা 17 থেকে 31 ভাগ, চুন শতকরা 30 থেকে 40 ভাগ, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড শতকরা 0 থেকে 17 ভাগ এবং সালফাইড যৌগ শত করা 0 থেকে 2 ভাগ থাকা চাই।

এই কাঁচা মালগুলি হতে প্রস্তুত সিমেণ্টের উপাদান-গুলি ও তাদের শতকরা পরিমাণ নীচে দেওয়া হলো। চুনঃ 60—66%, সিলিকাঃ 20—25%, অ্যালুমিনাঃ 3—8%, ফেরিক অক্সাইডঃ 2—6% এবং ম্যাঙ্গানাস অক্সাইডঃ 0.5—5%

সিমেণ্ট উৎপাদনের জন্যে প্রতিটি কাঁচা মালকে যন্ত্রের সাহায্যে মিহি গুঁড়োয় পরিণত করা হয় এবং আলাদা পাত্রে রাখা হয়। পাত্রগুলিকে 'স্টোরেজ বাংকার' বলা হয়। এরপর ঐ চূর্ণ পদার্থগুলিকে বের করে যথোপযুক্ত পরিমাণে মেশানো হয়। সেই মিশ্রণকে তারপর একটি ঘূর্ণায়মান চুল্লীতে ঢালা হয়। ঐ মিশ্রণ শুষ্ক অবস্থায় কিংবা 60% কঠিন ও 40% জলযুক্ত অর্থাৎ ভিজা অবস্থায় চুল্লীতে ঢালা যেতে পারে।

সিমেণ্ট কারখানার প্রাণকেন্দ্র হলো ঘূর্ণায়মান চুল্লীটি। চুল্লীর খোলটি ইস্পাতের তৈরি। তার ভেতর দিকটা উচ্চ তাপসহ মাটি দিয়ে তৈরি ইট্ দ্বারা আবৃত। চুল্লীটি সমান্তরাল ভূমির সঙ্গে ঈষৎ কাৎ করা অবস্থায় রাখা থাকে। আকৃতির উপর নির্ভর করে চুল্লীটি প্রতি মিনিটে 0.5 বার থেকে আরম্ভ করে করে তিনবার পর্যন্ত ঘুরতে সক্ষম। চুল্লীর ব্যাস 2 মিটার থেকে 4 মিটার এবং দৈর্ঘ্য আট মিটার থেকে 200 মিটার পর্যন্ত হতে পারে। চুল্লীর তলার দিকে এক প্রান্তে চূর্ণ কয়লা ও গরম বাতাস প্রবেশ করিয়ে চুল্লীর ভেতরকার কাঁচা মালগুলিকে উত্তপ্ত করার ব্যবস্থা থাকে। চুল্লীর তলাকার এই অংশের উষ্ণতা প্রায় 1400°C থেকে 1500°C পর্যন্ত হয়ে থাকে। দহনের জন্যে কখনও কখনও জ্বালানি তেলও ব্যবহার করা হয়। তবে জ্বালানি তেলের সঙ্গে চূর্ণ কয়লা ও গরম বাতাসও চাই।

এবারে আসা যাক্ চুল্লীর ভেতরকার বিক্রিয়ায়।

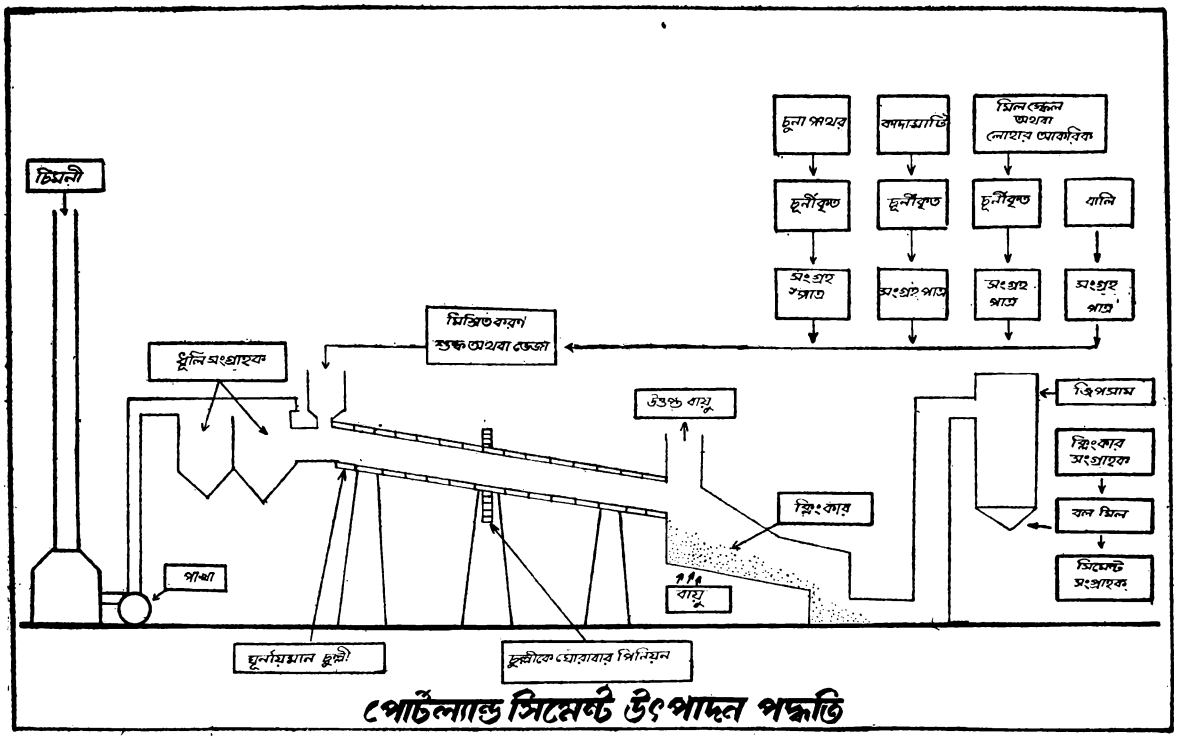

পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট উৎপাদন পদ্ধতি

সিমেন্টের উপাদান মিশ্রণকে যখন চুল্লীর এক প্রান্তের উপর থেকে ঢালা হয় তখন তা ধীরে ধীরে গরম হতে শুরু করে। প্রথমেই মিশ্রণের অন্তর্গত জলীয় অংশটুকু তাপ পেয়ে উঠে যায়। উপাদান-মিশ্রণ ভিজা থাকলে, উত্তপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর স্টীম উৎপন্ন হয়। উপাদান যৌগে, কেলাস-জল থাকলে, উচ্চ উষ্ণতায় তাও দূর হ'য়ে যায়। উপাদান মিশ্রণটি যতই নীচের দিকে নামতে থাকে, ততই বিবিধ রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটতে থাকে। বিক্রিয়ার ফলে উদ্বায়ী পদার্থগুলি এবং পটাসিয়ামের মত ক্ষারীয় মৌল সমূহের ক্লোরাইড লবণগুলি দূর হতে থাকে। চুন এবং সিলিকার মধ্যে বিক্রিয়া ঘটে যথাক্রমে উৎপন্ন হয় ডাই ও ট্রাই ক্যালসিয়াম সিলিকেট যৌগ। এ ভিন্ন উৎপন্ন হয় টেট্রা ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম ফেরাইট। উপাদান মিশ্রণে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড থাকলে তা বিক্রিয়া না ঘটিয়ে অবিকৃতই থেকে যায়।

উপাদান মিশ্রণটি যখন চুল্লীর উষ্ণতম অংশে নেমে আসে, তখন কঠিন যৌগগুলি গলতে শুরু করে। শতকরা 20 থেকে 30 ভাগ অংশই গলে যায়। গলিত তরল তখন না গলা কঠিন পদার্থগুলির সঙ্গে মিশে ঢেলা পাকায়। ঢেলা পাকানো সেই জিনিসটিকে বলা হয় 'ক্লিংকার'।

চুল্লীর তলার দিকে অবস্থিত একটি পথ দিয়ে ক্লিংকার বাইরে বেরিয়ে আসে। বায়ুপ্রবাহ দ্বারা ক্লিংকারকে সেখানে ঠাণ্ডা করা হয়। ক্লিংকারের সংস্পর্শে এসে বায়ু প্রবাহও দারুণ গরম হয়ে পড়ে। সেই গরম বাতাসকে বেরিয়ে যেতে না দিয়ে কৌশলে চুল্লীকে উত্তপ্ত করার কাজে ব্যবহার করা হয়। ক্লিংকার সঞ্চিত হয় যে আধারে, তাতে এবার যোগ করা হয় পরিমিত 'জিপসাম'।

জিপসাম যোগ করার পর শীতল ক্লিংকারকে আধার থেকে বের করে নিয়ে 'বল মিল' এ চূর্ণ করা হয়। বল মিলটি ইস্পাতের তৈরি ও বেলনাকার। তার মধ্যে অনেকগুলি ইস্পাতের গোলক বা বল থাকে। বল মিল ঘোরা শুরু করা মাত্রই তার ভেতরকার ইস্পাতের বলগুলি ঘুরতে থাকে এবং ক্লিংকারকে গুঁড়ো করতে থাকে। 'ক্লিংকার' সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত হ'য়ে সিমেন্টের রূপ লাভ করে। উৎপন্ন সিমেন্টকে উৎপত্তিস্থল থেকে সরিয়ে এনে উপযুক্ত আধারে সঞ্চিত ক'রে রাখা হয়। জলের সান্নিধ্যে

এলে জমাট বেঁধে সিমেন্ট খুব কঠিন হয়ে পড়ে। আর এই ধর্মটির জন্যই গৃহনির্মাণের উপকরণ রূপে সিমেন্টের এতো কদর।

নতুন ভারত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে লোহার পরেই সিমেন্টের স্থান। ভারতে প্রথম সিমেন্ট কারখানা স্থাপিত হয় 1904 খ্রীষ্টাব্দে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই কারখানাটি অচিরেই বন্ধ হ'য়ে যায়। আমাদের দেশে গুজরাটের পোরবন্দরে ইণ্ডিয়ান সিমেন্ট কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে 1914 খ্রীষ্টাব্দে একটি সিমেন্ট কারখানা গড়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই ভারতে সিমেন্ট শিল্পের সূত্রপাত হয়। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এদেশে বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠে নতুন নতুন সিমেন্ট কারখানা। 1934 খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানী'। এ দেশের বহু সিমেন্ট কারখানাই এই কোম্পানীর

নিয়ন্ত্রনাধীন। ভারতের কম বেশী পঞ্চান্নটি সিমেন্ট কারখানায় প্রায় ষাট হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়।

ভারতের অধিকাংশ সিমেন্ট উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হয় অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানী ও ডালমিয়া গ্রুপ দ্বারা। ভারতের দশটি সিমেন্ট কারখানা সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন। ভারতের এগারটি সিমেন্ট কারখানায় অ্যাসবেস্টাস—সিমেন্ট উৎপাদন করা হয়। এই এগারটি কারখানার মোট উৎপাদন ক্ষমতা 6·37 লক্ষ মেট্রিক টন।

পাঠকদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কিছু কিছু সিমেন্ট কারখানার অবস্থান উল্লেখ করছি। বিহারের ডালমিয়া নগর, চাই বাসা, চোপান; তামিলনাড়ুর ডালমিয়াপুরম, শঙ্করীদুর্গ, মধুকরনি; অন্ধ্রপ্রদেশের বেজোয়াদা ভিজিয়ানাগ্রাম, পানিয়াম; গুজরাটের শেভালিয়া, ভবনগর, পোরবন্দর, কর্ণাটকের সাহাবাদ, ভদ্রাবতী, বাঙ্গালোর; মধ্য প্রদেশের জবলপুর, দুর্গ, কাট্‌নী; রাজস্থানের লাখেরী, উদয়পুর, চিতোরগড়; উত্তর প্রদেশের চুর্ক, বাবগরচুর, দাদ্‌লা; কেরালার কোট্টায়ম এবং উড়িষ্যার রাজগাংপুর সিমেন্ট কারখানা উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবাংলায় মাত্র একটি সিমেন্ট কারখানা আছে। সেটি দুর্গাপুরে অবস্থিত।

ভারতের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রূপায়নে সিমেন্টের চাহিদা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। অথচ চাহিদার তুলনায় এদেশে সিমেন্টের উৎপাদন কম। ঘাটতি পূরণের জন্যে তাই আমাদের বিদেশ থেকে সিমেন্ট আমদানী করতে হয়। সিমেন্টের ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো 'সিমেন্ট করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া' নামে একটি সংস্থা গঠন। এই সংস্থার কাজ হলো দেশে সিমেন্টের প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের অনুসন্ধান করা, উচ্চ মানের চুনাপাথর উৎপাদন করা এবং নতুন নতুন সিমেন্ট কারখানা স্থাপন করা। এই করপোরেশনের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ভারত সিমেন্ট উৎপাদনে শুধু স্বয়ম্ভরই হবে না, বিদেশেও এই মূল্যবান পণ্যটি রপ্তানী করতে পারবে।

এন. বি. টি-99A, নিউট্রাফিক, খড়্গপুর।

প্রাণী-বিচিত্রা

শৈলেন চক্রবর্তী

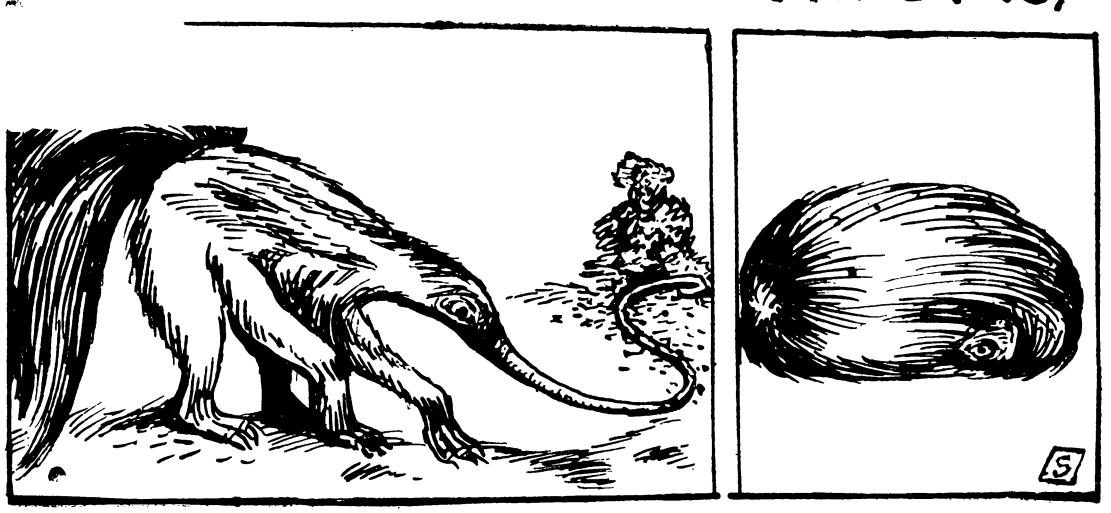

পিঁপড়ে আমাদের কামড়ায়। কিন্তু পিঁপড়ে উইপোকা খায় মার্কিন দেশের মস্ত এক প্রাণী তার নাম 'অ্যান্টইটার'। তার যেমন বিরাট লম্বা জিবে আটকে যায় পিঁপড়েরা, আর ল্যাজখানি লম্বা লম্বা চুলের যেন প্রকাণ্ড একটি চামর।

ঘুমের সময় সে নিজেকে গুটিয়ে নেয় ও ল্যাজ দিয়ে ঢেকে একটা তাল পাকায়। যেন উলের বল। শত্রুরা ওকে চিনতে না পেরে বোকা বনে যায়।

রত্নমণিহার

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

রত্নালঙ্কার বানাতে এমন একটি ধাতুর প্রয়োজন যা সব দেশে সহজ প্রাপ্য অথচ মূল্যবান রূপে গ্রাহ্য। খনি থেকে তোলা সোনা সহজে আলাদা করা যায়। খুঁজেও পাওয়া যায় সহজে। ছাকুনি দিয়ে নদীর বালি-জলের সঙ্গে মিশে থাকা স্বর্ণরেণু আলাদা করে ফেলাও কঠিন নয়। অতীতে সুবর্ণ রেখার জলেও নাকি স্বর্ণরেণু পাওয়া যেত। প্রাচীন গ্রীসে স্বর্ণবাহী জলস্রোত থেকে স্বর্ণ-কণিকা বেছে নেওয়ার জন্যে এক বিচিত্র কৌশল অবলম্বন করার রেওয়াজ ছিল। লোমশুদ্ধ সদ্য ছাড়ানো একটি ভেড়ার চামড়া ডুবিয়ে রাখা হতো নদীর জলে; ভেড়ার আঠালো পশমে স্বর্ণরেণুগুলো আটকে যেতো; কয়েক ঘণ্টা অন্তর স্বর্ণরেণু ভরা ভেড়ার ঐ চামড়া জল থেকে তুলে রেণু-গুলো ঝেড়ে নেওয়া হতো; তারপর আবার ডুবিয়ে দেওয়া হতো ঐ ছালটি। স্বর্ণ সংগ্রহের ঐ বিশেষ প্রক্রিয়ার থেকেই সম্ভবতঃ গ্রীক পুরাণের বিখ্যাত 'গোল্ডেন ফ্লিসে'র কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। শুনলে অবাক হবে যে এক ট্রয় আউন্স পরিমাণ সোনা থেকে 60 মাইল লম্বা অতি সূক্ষ্ম তার বানানো সম্ভব কিংবা স্বর্ণকার সেই স্বর্ণ খণ্ডকে পিটিয়ে এক ইঞ্চির দু'লক্ষ ভাগের এক ভাগ পাতলা একটি সোনার পাত বানাতে পারেন। এই দৃষ্টান্ত তার নমনীয়তা ও দৃঢ়তার পরিচয় বহন করছে।

সোনার তুলনায় রূপো অপেক্ষাকৃত কঠিন ও কম নমনীয়। সোনার সঙ্গে বেশি পরিমাণ রূপোর খাদ মিশিয়ে অতীতে যে মিশ্র ধাতুটি পাওয়া গিয়েছিল তার নাম 'ইলেকট্রাম'; সুমেরীয় সভ্যতার পীঠস্থান উর নগরীতে উৎখননের কালে ঐ মিশ্র ধাতুতে গড়া অলঙ্কার, তৈজস পাওয়া গেছে। খ্রীঃ পূঃ ২000 অব্দ থেকে সোনার সঙ্গে রূপোর ব্যবসাও চলছে। তবে গন্ধকের সংস্পর্শে রূপোর জেল্লা কমে যায়। তাতে কালচে ছোপ ধরে। কিন্তু সোনায় তেমন মরচে ধরে না, বহু ব্যবহারে তার দীপ্তি মলিন হয় না। তাই অপেক্ষাকৃত সুলভ (দামে ও প্রাপ্যতার বিচারে) রূপোর চাহিদা অলঙ্কার-শিল্পীর কাছে যতই বাড়ুক না কেন রত্নালঙ্কার নির্মাণে সোনা এখনও আদর্শ ধাতু।

একালে আর একটি দামি ধাতু রত্নালঙ্কার নির্মাণে ব্যবহৃত হচ্ছে—সেটি প্ল্যাটিনাম। দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়ায় ১৭৩৫ সালে পিন্টো নদীর পলিস্তরে স্পেন দেশীয় হানাদারের প্রথম ঐ দুর্লভ ধাতুটির খোঁজ পায়; তখন তার নাম দেওয়া হয়—'প্ল্যাটিনা ডেল পিন্টো' বা 'পিন্টো নদীতে পাওয়া রূপো জাতীয় ধাতু'। পরে নাম হয় প্ল্যাটিনাম বা 'সামান্য রূপা'! প্ল্যাটিনামে গলনাঙ্ক ১৭৭৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হলেও দীপ্তি, স্থায়িত্ব, দৃঢ়তার জন্যে একালের মণিকারেরা ঐ ধাতুটি ব্যবহার করছেন।

যদি কেউ প্রশ্ন করো, অতীতের রত্ন শিল্পের সেরা নমুনাটি কোথায় গেলে দেখতে পাওয়া যাবে? আমি তাকে মিশরের ফারা বা সম্রাট টুটেন খামেনের (খ্রীঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দী) রত্ন ভাণ্ডার দেখার পরামর্শ দেব। বিশেষ করে নানা রত্ন খচিত সোনার কফিন ও অকালমৃত তরুণ সম্রাটের সোনার আবক্ষ মুখোস—আবরণটি। এছাড়া দেখতে বলব অজন্তার গুহায় গুহায় রাজা রাণী, অপ্সরা, যক্ষী, নর্তকী প্রভৃতির নানা অলঙ্কারে সজ্জিত প্রতিকৃতিগুলি পাটনার দিদারগঞ্জে পাওয়া নানা আভরণে ভূষিতা যক্ষিণীর অনবদ্য পাষাণ ভাস্কর্যটি (খ্রীঃ পূঃ ১ম শতক)। পম্পেই নগরীর নানা ভিলার দেওয়ালে আঁকা রোমান রমণীর রমণীয় যে মুরাল চিত্রগুলি উৎখননের মাধ্যমে আবিষ্কৃত সেখানেও দেখি কত বিচিত্র অলঙ্কারের সমারোহ। বাইজেন্টিয়ান মোজেইক চিত্রমালায় রত্নালঙ্কারের আরও বিচিত্র প্রদর্শনী। সমকালে ভারতের হালেবিদ বেলুড় অঞ্চলে নির্মিত (কর্ণাটক) মন্দির-ভাস্কর্যে নানা অলঙ্কারের অতি সূক্ষ্ম ও আড়ম্বরময় রূপায়ন একালের মণিকারকেও স্তম্ভিত করতে পারে। (২য় শালেশ্বর মন্দিরের প্রবেশ পথে দ্বার পালের মূর্তি, তার অঙ্গে 25 রকমের অলঙ্কার, দ্বাদশ শতাব্দী)। নালান্দা অঞ্চলে প্রাপ্ত মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি দেবী মূর্তির অঙ্গেও দেখি টায়রা, মুকুট, কর্ণাভরণ, নানা রকম মনিহার, পায়ে মল, কোমরে চন্দ্রহার, মাথায় পঞ্চ চূড়া!

প্রসন্ন ভবন, গোবরডাঙা, 24 পরগনা।

জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় ঃ গ্রন্থাগার

গণশিক্ষার অন্যতম প্রয়োজনীয় মাধ্যম গ্রন্থাগার। তাই বামফ্রন্ট সরকারের সামগ্রিক শিক্ষানীতিতে গ্রন্থাগার উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শুধু মুষ্টিমেয় মানুষের নান্দনিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য নয়—শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য জীবিকাশ্রয়ী মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সাহায্য করে আসছে।

গত ছ'বছরে পশ্চিমবঙ্গে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৭৬২ থেকে বৃদ্ধিপেয়ে হয়েছে ২৪১০টি। এই সময়ে রাজ্য বাজেটে গ্রন্থাগার উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে মোট প্রায় ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। জেলা, মহকুমা এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির বার্ষিক অনুদান পাঁচ হাজার, তিন হাজার এবং ছয়শত টাকা পরিবর্তে বাড়িয়ে যথাক্রমে পঞ্চাশ হাজার, দশ হাজার এবং চার হাজার টাকা করা হয়েছে।

১৯৭৯ সালে প্রবর্তিত গ্রন্থাগার আইন এবং পরবর্তীকালে এই আইনের কয়েকটি সংশোধনের মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়েছে গঠিত হয়েছে। একটি পৃথক গ্রন্থাগার এবং রাজ্য গ্রন্থাগার সংসদ।

রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় শিক্ষায় অনগ্রসর এলাকায় সাধারণ মানুষের জন্য গ্রন্থ ব্যবহারের সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে। পাঠক সাধারণের সামাজিক চেতনা, জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করছে এই গ্রন্থাগারগুলি।

সবস্তরের মানুষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান, জনগণের অফুরন্ত জিজ্ঞাসা জ্ঞানভাণ্ডার এই গ্রন্থাগার। অজানাকে জানার জন্য শিশুমনের অপরিসীম আগ্রহের কথা স্মরণ রেখে রাজ্য সরকার সম্প্রতি প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮৩৭টি পাঠাগারে শিশুদের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছে। শিশুদের জন্য এরকম ব্যবস্থা ভারতবর্ষে অভিনব।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে সমাজসেবী মানুষের উপর এক গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে গ্রন্থাগারের সঠিক ব্যবহারের সাহায্যে শিক্ষার স্মৃতির ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের সম্ভাবনাকে সার্থক করে তুলুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

তথ্য ও সংস্কৃতি ১৯৪৬/৮৪

দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়

আজ পথে ঘাটে হরদম কিড়িং কিড়িং ঘণ্টি বাজিয়ে যে দু' চাকাওয়ালা গাড়িটিকে ছুটতে দেখা যায়—যার নাম বাইসিকল বা বাই-সাইকেল—এর জন্ম ফ্রান্সে। আনুমানিক 1800 খ্রীষ্টাব্দে। এর প্রথম নাম ছিল 'ভেলোসিপিড' (Velocepede)।

প্রথম যখন সাইকেল আবিষ্কার হয় তখন এর চেহারাটা ছিল অদ্ভুত। না ছিল প্যাডেল। না ছিল চাকায় টায়ার-টিউভ। দুটো লোহার চাকার ওপর যন্ত্রটা বসানো থাকতো। মাটিতে পায়ের সাহায্যে ধাক্কা দিয়ে সেটা চালাতে হত। এ হেন সাইকেলে চড়লে আরহীর মুশকিল হত কি, লোহার চাকার ধাক্কায় তার গা হাত পায়ে ব্যথা হয়ে যেত।

অগত্যা আবিষ্কার হলো চাকার সঙ্গে রবারের টায়ার জুড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা। সেটা চালু হলো ইং 1880 সালে। কিন্তু মুশকিল বাঁধলো এখানেও। হাওয়াহীন নীরেট টায়ার, দু'পা চালাতেই সেটা লাফ মেরে আকাশে উঠতে চায়। লাফালাফির ফলে চালকেরও হতো হাড় মাংস একাকার হয়ে যাবার অবস্থা।

অবশেষে আবিষ্কার হলো আজকের নিরাপদ বাই সাইকেল (Safety bicycle)। সেটা 1887 সালের কথা। জন বয়েড ডানলপ নামে একজন স্কটল্যাণ্ডের লোক হাওয়া ভর্তি টায়ার আবিষ্কার করলেন। ঠিক এই সময় তিন চাকার সাইকেল—যার নাম রিক্‌শ, সেটাও চালু হলো।

আমাদের দেশে সাইকেল চালু হয় 1889 সালে। ভারতে প্রথম সাইকেল চলেছিল কলকাতা শহরে। এর প্রবর্তক হলেন হেমেন্দ্রমোহন বোস। সেকালে হ্যারিসন রোডে তাঁর বাই-সাইকেলের দোকান ছিল। তিনিই প্রথম দু'জন বাঙালীকে (স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, স্যার প্রফুল্ল রায় ও নীলরতন সরকার) সাইকেলে চড়া শিখিয়েছিলেন।

প্রথম যখন আমাদের দেশে সাইকেল চালু হয় তখন ফ্লাইং ক্লাবের মতো সাইকেল ক্লাব তৈরি হয়েছিল। সেখানে সাইকেল দৌড় প্রতিযোগিতা হতো। আজ অবশ্য এরকম ক্লাবের অস্তিত্ব নেই।

আমাদের দেশে আদি সাইকেলের দোকানদার হরিদাস নন্দী। 50/6 ধর্মতলা স্ট্রীটে তাঁর দোকান আজও আছে।

এ-22/14 সাঁতরাগাছি রেলওয়ে কলোনী, জগাছা, হাওড়া

ট্রামের সৃষ্টি হল কবে, কোথায়? কলকাতায়বা কখন ট্রাম চলতে শুরু করল—এমন সব মজা আর কৌতুহলোদ্দীপক লেখা—'ট্রাম গাড়ীর কাহিনী' থাকছে আগামী সংখ্যায়।

সাদামাথা সাকি

রাধারমণ রায়

আমরা প্রায়ই শুনে থাকি, বানর হচ্ছে মানুষের পূর্ব-পুরুষ। কিন্তু এটা নেহাৎই একটা কথার কথা, সত্যের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। বিজ্ঞানীরা বলেন, নর আর বানর উভয়েরই পূর্বপুরুষ এক। একই বংশধারা থেকে উভয়ের উৎপত্তি।

দেশ ভেদে মানুষের আকার-প্রকার-আচরণ যেমন বিভিন্ন রকমের হয়, বানরের আকার-প্রকার-আচরণও তেমনই বিভিন্ন রকমের হয়। সাকি (SAKI) নামে এক জাতের বানর আছে, যার আকার-প্রকার-আচরণের সঙ্গে অন্য কোনো বানরের আকার-প্রকার-আচরণের বিশেষ মিল নেই।

সাকিদের বাসস্থান দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল দেশে। ব্রাজিল দেশের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো। এই দেশটি জন্ম দিয়েছে অনেক বড়ো বড়ো ফুটবল খেলোয়াড়ের। পেলের জন্ম এ দেশেই। পৃথিবী বিখ্যাত আমাজন নদীর (৩, ৯৩৫ নাইল দীর্ঘ) বেশির ভাগটাই এদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত। সাকিরা হচ্ছে এদেশেরই বানর। তবে গিয়ানাও এদের কাছে পরভূমি না। সেখানেও এদের দেখা মেলে।

সাকি জাতীয় বানরদের মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত দেখতে হচ্ছে সাদামাথা সাকি। এদের গায়ে আছে কম্বলের মতন পুরু অথচ লম্বা লম্বা লোম। এদের লেজও ভীষণ মোটা, আর লোমের জঙ্গলে ভর্তি। কেবল মুখ আর মাথার অল্প কিছুটা অংশ বাদে এদের সারা গা আর লেজের রঙ কুচকুচে কালো। এদের মাথাটা দেখতে সাদা।

দেখতে সাদা হলেও এদের মাথার রঙ সত্যিই কিন্তু সাদা নয়। গিরিমাটির মতন ফ্যাকাসে রঙের ছোটো ছোটো লোমে এদের মুখ আর মাথার খানিকটা অংশ ভর্তি। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন এরা সাদা রঙের মুখোস পরে আছে। ছবিটা দেখলেই এদের চেহারাটা কেমন বুঝতে পারবে।

সাদামাথা সাকিদের আচরণও বড়ো অদ্ভুত। অন্য বানরদের মতন এরা বাঁদরামি করে না। এরা বড়ো লাজুক স্বভাবের। মানুষ দেখলেই লুকিয়ে পড়ে জঙ্গলের গভীরে। তাছাড়া এরা স্বাধীনভাবে বাস করতেও খুব ভালোবাসে। বন্দী অবস্থায় এরা বেশি দিন বাঁচে না। তাই চিড়িয়াখানায় এদের দেখা যায় না। এমন কি এদের জন্ম যে দেশে, সে-দেশের মাটিতেও এরা বন্দী অবস্থায় বেশি দিন বাঁচে না।

5, সর্দার শঙ্কর রোড, কলকাতা-26

ঘূর্ণিঝড়

চিত্তরঞ্জন ঘোষাল

ঠিক দুপুরটা সবেমাত্র পেরোচ্ছে অর্থাৎ সময়টা হবে বেলা দুটো কি আড়াইটে। হাতে ঘড়ি ছিলনা। দিনটা ছিল ছুটির। তাই পোষাকী সাজে বিবাদী বাগ থেকে কলেজ স্ট্রীটের বই পাড়ায় ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটোছুটির কোন প্রয়োজন ছিলনা। দু-ভাঁজ করা কাপড়টা কোমরে জড়িয়ে, আদুল-গায়ে গামছা ঢেকে একেবারে একটা অলস মন নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলাম আমাদেরই বাড়ির সামনে খামারের উত্তর-প্রান্তে ইংরেজি 'L' অক্ষরের মত বেঁকে যাওয়া পুকুরের ধারে।

বিশাল পুকুর চলে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে কিছুটা লম্বাকারে। উত্তর-প্রান্তে পিচ-বাঁধানো সড়ক—পূবমুখো কয়েক ক্রোশের পথ চুঁচুড়া শহর আর পশ্চিম-মুখো এঁকে বেঁকে তারকেশ্বর। শুনেছি, অনেকে নাকি মাঝরাতে পশ্চিম-পাড়ে দাঁড়িয়ে পূব-পাড়ের যেখানটা বিশেষ করে বাঁশের ঝাড়ে আড়াল করে রেখেছে সেখানটায়, অনেক ভুতুড়ে আলোর নাচও দেখেছে।

একদিন খামারের ধারে উত্তরমুখো পুকুর পাড়ে আসতেই দেখি হাত ছিপ ফেলে বসে আছে সোনা,—অর্থাৎ সোনা বাউড়ি; মাথায় চার-ভাঁজ গামছা। সময়টা জ্যৈষ্ঠের দুপুর। কাল-বৈশেখীর কাল পেরিয়ে গেছে। পরিষ্কার আকাশে ঝকঝকে রোদ ঝকঝক করে উঠছে পুকুরের জলে।

পিচ রাস্তার উত্তর-গাঁয়েই বাউড়ি-পাড়ায় থাকে সোনা; ক্ষেতমজুরি করে দিন কাটায়। এখন আর মাঠের কোন কাজ নেই তাই সময় কাটায় ছিপের ফতনায় চোখ রেখে সকাল থেকে প্রায়-সন্ধ্যে। পুঁটি মাছ ধরার ছোট্ট বঁড়শির হাত ছিপ হলে কী হবে আড়াই-তিনশো গ্রাম ছোট পোনা উঠে আসে স্বচ্ছন্দে। আর যেদিন ঐ রকম গোটা দুই-তিন তুলতে পারে, কোনরকমে পুষিয়ে যাবে মজুরি।

কটা হলোরে? —সোনাকে দেখে জিজ্ঞেস করি আমি।

একটাও না। বড় কাঁকড়ার উৎপাত। —ফতনা থেকে চোখ না ফিরিয়েই জবাব দেয় সোনা।

ফত্‌নাটা নড়ছে। পাক্কা শিকারীর মত তৈরী হয়ে বসে আছে সোনা। ডোবালেই খ্যাঁচ।

ফতনাটা ডুবেছিল ঠিকই; সঙ্গে সঙ্গে খ্যাঁচও দিয়েছিল সোনা কিন্তু মাছ ওঠেনি। ওঠেছিল, সত্যিই একটা কাঁকড়া। অবশ্য কাঁকড়া যে উঠবে ফত্‌না ডোবার মুহূর্তে, খ্যাঁচ দিতে গিয়ে সোনা বলেওছিল। বিশ্বাস করিনি। বিশ্বাস করলাম কথাটা ফলে যেতে। ছিপ্ যারা ফেলে, ফতনার নড়াচড়া দেখে তারা বলে দিতে পারে, মাছে ঠোকরাচ্ছে, না অন্য কিছুতে; মাছ হ'লে কি মাছ এবং কত বড় মাছ হতে পারে। এ-ব্যাপারে আমি একেবারেই আনাড়ি।

বঁড়শির ছুঁচ্‌মুখে লোভনীয় টোপ গেঁথে সবেমাত্র আবার ছিপটা ফেলেছে সোনা; ঠিক সেই মুহূর্তে পুকুরের উত্তর পাড়ে পিচ রাস্তার কোল ঘেঁসে দুলে উঠলো কলাগাছ আর নারকেল গাছের পাতা, নিমগাছের ডাল আর একটু উত্তরে জট্ পাকানো বাঁশঝাড়ের ডগা। প্রথমে একটু, আস্তে, তারপর একটু জোরে, তারপর আরও একটু। তারপর রীতিমত একটা ঘূর্ণীঝড় তুমুল আলোড়ন তুলে বেরিয়ে গেল পশ্চিম থেকে পূবে—কোণাকুনি।

মাত্র কয়েক হাত তফাতে—কত আর হবে একশো হাত, কী দুরন্ত বেগে চলে গেল একটা ঘূর্ণীঝড় খোড়ো ঘরের চাল লণ্ডভণ্ড করে, পেঁপে গাছের ডাল ভেঙ্গে। অথচ, একশো হাত তফাতে দাঁড়িয়ে তার কোন আঁচও পেলাম না আমরা। খামারের একপ্রান্তে শিরীষ গাছ। তারপর ছোট্ট একটা বাঁশঝাড়, তার পর নারকেল গাছের সারি; দুললো না তাদের একটা পাতাও। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ঝোড়ো-মেঘের ছিঁটে-ফোঁটা নেই কোথাও; রোদ তখনও ঠিকরে পড়ছে। অথচ একটা ঝড় উঠলো, রীতিমত ঘূর্ণীঝড়, বয়ে গেল নির্দিষ্ট একটা স্থান দিয়ে। ব্যাপারটা খুবই অবাক করলো আমাকে, বিস্মিত করলো তার থেকেও বেশি।

—দেখলি সোনা, তোদের পাড়ার ওপর দিয়ে কেমন একটা ঝড় বয়ে গেল?

—তুমি আজ দেখছ? ও তো প্রায়ই যায়। ঠিক কোনাকুনি।

—প্রায়ই! মানে?

—মানে, ধর না কেন, দিন দশ অন্তর।

—বলিস কি? ঠিক ঐ জায়গা দিয়ে?

—হ্যাঁ, ঠিক ঐ জায়গা দিয়ে।

পশ্চিম থেকে পূবে কোণাকুনি বয়ে গেল ঝড়টা। চোখের সামনেই দেখলাম। দেখলাম ধনা বাউড়ির চালের খোলা উড়িয়ে ধামু বাউড়ির খড়ের চালে গোত্তা দিয়ে চলে গেল। কতদূর গেল ঝড়টা?

পুকুরের পূব-পাড়ে পিচ রাস্তার কোল ঘেঁসে কোমর-পাড়া ঢোকার রাস্তা পেরিয়ে হাটপুকুর ডিঙ্গিয়ে বামনা-পুকুরের ধারে শ্মশান। পেরিয়ে গেল দুলেদের বসত্। বেশ কয়েক ঘর দুলের বাস। দুলে-মেয়েরা শুকতারা মাথায় ছাঁকনি জাল নিয়ে বের হয় পুকুরে পুকুরে চিংড়ি মাছ ধরতে। পুরুষেরা খাটে মাঠে।

হিসেব করে দেখলাম ঝড়টা যে বেগে গেল অন্ততঃ কয়েক মাইলের গতিবেগ আছে তার মধ্যে। আর যে-পথ দিয়ে গেল, তাতে রাম কিংবা অজু দুলের খোড়ো ঘরের ওপর দিয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। নিশ্চয় তাদের চালেরও কিছু ক্ষয়-ক্ষতি হয়ে থাকবে।

রোদের তাপ একটু কমতেই পা-পা করে হাজির হলাম দুলে পাড়ার মোড়ে। পাড়ার ভেতর ঢুকতে হলোনা। সামনেই জগার চায়ের দোকানে দেখা হয়ে গেল ওদের সঙ্গে। ঝড়ের কথা জিজ্ঞেস করতেই ওরা তো অবাক—ঝড়! ঘূর্ণীঝড়! দুপুরে! কখন গো! গরমে প্রাণ আই-ঢাই করছে। একটু ঝোড়ো হাওয়া পেলে তো বেঁচে যেতাম গো, বড়বাবু!

বুঝলাম বাউড়ি পাড়ার ওপর দিয়ে যে ঝড় দুপুরে বয়ে গেছে, তার বিন্দুবিসর্গ আঁচও এদের কাছে এসে পৌঁছয়নি। আশ্চর্য হলাম আরও। গতিবেগ সম্বন্ধে যে অঙ্ক কষেছিলাম, প্রথমতঃ, তা ভুল হতে দেখে। তার চেয়েও বিস্মিত হলাম, ঝড়টা কোথায় গিয়ে বিলীন হয়ে গেল তার কোন হদিশ করতে না পেরে।

পরদিন সকাল হতেই সোনাকে ডেকে জিজ্ঞেস করি —আচ্ছা সোনা, ঝড়টা তো গেল পশ্চিম থেকে পূবে। পূব থেকে পশ্চিমে কখনো বয়ে যেতে দেখেছিস?

—হ্যাঁ, নির্বিকার সোনা বললো—এইতো কদিন আগে, সাত-আট দিন বোধ হয় হবে, গেল। হারু চৌকিদারের সদ্য-বোনা কঞ্চির ঝুড়িটা শুকোতে দিয়েছিল সামনের কুলগাছের ডালে, তাকে তুলে ঘুরপাক খাইয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল আইড়ি-পুকুরের জলে।

—বলিস কী? তা, তোরা এ ব্যাপারে কোন খোঁজ নিসনি?

—কি খোঁজ নেব? সেই ছোট বেলা থেকে দেখে

আসছি। মাকে অবশ্য একবার জিজ্ঞেস করেছিলুম। মা বলেছিল, অমূল্য কাকা নাকি একবার ওঝা আনিয়েছিল। সে বলে গেছে ঐ সময় ওপর দিয়ে ঠাকুরের রথ যায়। তারই দাপটে নাকি ঐরকম একটা ঝড় ওঠে।

—ঠাকুরের রথ! কী ঠাকুর রে! সোনা?

—অতশত জানিনা, কাকা। কখনও চোখেও দেখিনি, শুনেছি এই পর্যন্ত।

আমার কিন্তু মন মানলো না শুনে। জেদ চাপলো খুঁজে বের ক'রতেই হবে এর কারণ। কোথা থেকে ওঠে এই ঝড়, আর কোথায়ই বা এর শেষ?

তারপর থেকেই ছিলাম তকে তকে। ঠিক দশদিনের দিন। ঠায় রোদ মাথায় পথের ওপরই অপেক্ষায় আছি ঝড়ের। অবশেষে, সত্যি সত্যিই এক সময় দুলে উঠলো কলাগাছের পাতা, বাঁশ বাগানের জট পাকানো ডগা। প্রথমে আস্তে। তারপর মুহূর্তের মধ্যে প্রলয় ঘটে গেল যেন। মাটির ওপর থেকে ঝাঁক ঝাঁক ধুলোর সঙ্গে ছেঁড়া কাগজ, ঝরা পাতা কে যেন এক প্রচণ্ড টানে ঘুরপাক খাইয়ে ওপর দিকে তুলে নিতে নিতে ছুটে চললো পূব-দিকে। নিজেকে সামলাবার সুযোগটুকু নেবার আগেই এক মুঠো ধুলো আছড়ে পড়েছিল আমার চোখের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে দারুণ জ্বালায় বন্ধ হয়ে গেল দু-চোখ। তবুও রগড়ে চোখের পাতা কোনরকমে অর্ধেক খুলে আমিও দ্রুত পা-চালাতে চেষ্টা করলাম ওরই সঙ্গে পিচ রাস্তার ওপর দিয়ে। যাওয়া কী সম্ভব? তবুও গিয়েছিলাম বেশ কিছুটা। যদিও চোখের জ্বালা তখনো কমেনি, তবু ওরই মধ্যে দৃষ্টি শক্তি একটু স্বচ্ছ হয়েছিল। তারই মধ্য দিয়ে দেখলাম গ্রামের পূর্বপ্রান্তে বামনা পুকুরের ধারে শ্মশানের কয়েক হাত পশ্চিমে বিরাট বটগাছটার নীচে, যেখানে পাড়ার ছেলেরা ধুমধাম করে শ্মশান-কালীর পূজো করে, ঠিক সেইখানটায়। ওপরের ধুলো, কুচো কাগজ, ঝরা পাতা, হঠাৎ যেন এক মন্ত্রবলে ঝুপ করে নিচে নেমে একেবারে নিথর হয়ে গেল। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। একটা স্বপ্নের মত কেটে গেল যেন। দেখলাম ঘূর্ণীঝড়ের শেষ সীমানা। কিন্তু উৎপত্তি।

তারও সন্ধান পেলাম আর একদিন।

বাউড়ি পাড়ার ঠিক পিছনেই উত্তর কোণে আইড়ি পুকুর। তারই টান-টান মাটির রাস্তা পেরিয়ে বুড়ো-পুকুর। খানিকটা আগাছার জঙ্গল ডিঙ্গিয়ে পূব-পশ্চিমে লম্বা মজা-দীঘি তারই পশ্চিমে প্রায় দুশে বছরের পুরনো নন্দদুলালের মন্দির। তিনদিকে তার আশ-শ্যাওড়া আর নাম না জানা গাছের জঙ্গল।

তারপর থেকেই সময়ে অসময়ে আমার চিন্তার জগতে লাগলো ঘূর্ণী। কেমন করে ঘটছে কেনই বা ঘটছে?

কি খোঁজ নেব? সেই ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি

কোন একটা কিছু যখন ঘটে তখন পিছনে তার একটা কারণ থাকবে নিশ্চয়ই। ওরা জানে ঠাকুরের রথ যায়। পশ্চিমের নন্দদুলাল কি তবে মাঝে মাঝে যায় পূবে শ্মশান কালীর সঙ্গে গাল-গপ্প করতে? ধ্যুৎ তাই কখনো হয় নাকি? ঘটনাটা যখন প্রাকৃতিক, কারণটাও নিশ্চয়ই প্রাকৃতিক।

কোন স্থানের বায়ু হঠাৎ হাল্কা হয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা না করলে তো আর ঘূর্ণীঝড় উঠতে পারেনা। ঠিক যেখানটা দিয়ে যেখান পর্যন্ত এই ঝড় ছুটে যাচ্ছে তার দুপাশে ডোবা আর জলজ-ভরা মজা পুকুর। স্বাভাবিকভাবেই মাঝখানের এই মাটি হয়ে থাকে ভিজে, স্যাঁৎসেতে। তার ওপর রোদের তাপ পড়তে পড়তে একসময় হাল্কা হয়ে নিচের বাতাসের পক্ষে ওপরে ওঠার চেষ্টা করা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। তারই ফলে এই ঘূর্ণিঝড়। সঙ্গে সঙ্গে তৃপ্তিতে ভরে উঠলো নিজের বুক আর ঠিক করলাম, সোনাদের একদিন বুঝিয়ে বলতে হবে ব্যাপারটা; ওদের ঐ ঠাকুর দেবতার ভুল বা সংস্কার ভেঙ্গে দেওয়া উচিত।

গ্রাম ও পোঃ গুরাপ, হুগলী

মনীন্দ্র নাথ দাস

বালির প্রধান উপাদান সিলিকা বা সিলিকন-ডাই-অক্সাইড, এরসঙ্গে মাটি, লৌহ, খড়ি, আদি বস্তু যৌগিক অবস্থায় থাকতে পারে। গ্র্যানাইটাদি সিলিকন প্রধান প্রস্তর কালক্রমে শীত গ্রীষ্ম, জলবায়ু ও সূর্যতাপের প্রভাবে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে বালিতে পরিণত হয়। বালি সাধারণত সমুদ্র তীরে, নদীতটে ও মরুভূমিতে পাওয়া যায়। বালুকা কণা ·05 মিলিমিটার থেকে 2 মিলিমিটার পর্যন্ত বড় হতে পারে। বালির বর্ণ ধূসর, হলদে, বাদামী, লাল ও কালো রঙের হয়ে থাকে, এর কারণ বিভিন্ন পরিমাণে লৌহযুক্ত মিশ্রবস্তুর উপস্থিতি। কখনও কখনও বালির সঙ্গে সোনা রাং, থোরিয়াস, ইউরেনিয়াম (Uranium), চৌম্বক লৌহকণা বা Magnetite ও তামাড় (Garnet) মিশ্রিত থাকে।

বালুকা ও মাটিমিশ্রিত জলের সঙ্গে খটিকাদি পদার্থ মিলিত হলে তথাকথিত চোরাবালির উৎপত্তি হয়। অসতর্ক হলেই এর মধ্যে ভারি জীবদেহ ক্রমশ নিমজ্জিত হয়ে যায়। চোরাবালি সচরাচর নদীর মোহানায় অথবা সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চলে দেখা যায়।

চূণ বা সিমেণ্টের সঙ্গে বালি মিশিয়ে ইঁট পোড়বার মশলা, কংক্রিট এবং পলাস্তারা করবার কাজ করা হয়। এছাড়া কাচ তৈরী ও চিনেমাটির পাত্র প্রস্তুত করতেও বিশুদ্ধ পরিষ্কার সাদা বালি লাগে। ঘষবার মাজবার জন্য এবং জল ছেঁকে পরিষ্কার করতেও বালির বিশেষ ব্যবহার আছে।

দক্ষিণ ভারতে মালাবার ও করমণ্ডল সমুদ্রউপকূলবর্ত্তী অঞ্চলে মনাজাইট বালি পাওয়া যায়, এতে শতকরা আট-দশভাগ থোরিয়াম ও 0·3% থেকে 0·8% ইউরেনিয়াম অক্সাইড থাকে, এজন্য এই বালি তেজস্কর (Radio-active) পদার্থের মধ্যে বর্ণনীয়। অন্ধকার জায়গায় এই বালি ফোটোগ্রাফিক ফিল্ম বা প্লেটের উপর বেশ কয়েক-দিন ছড়িয়ে রাখলে তেজোরশ্মি নির্গমণের ফলে তাতে দাগ পড়ে যায়।

একরকম আশ্চর্য্যজনক বালি আছে, যাকে সঙ্গীত কারী বালুকা (Singing Sand) বলা হয়, এই প্রকার শব্দোৎ-পাদক বালি দুই হাতে ধরে চেপে জোরে ঘষলে সুন্দর সুমধুর সুর শোনা যায়। এই রকম শব্দ কারী বালির অস্তিত্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইটালিয়ান পর্য্যটক মার্কো পোলো মধ্য এশিয়াতে দেখেছিলেন। মধ্যযুগের সুবিখ্যাত মুসলমান ভ্রমণকারী ইবন বতুতা আরব দেশে এই জাতীয় বাজনাবাজা বালির সন্ধান পেয়েছিলেন। এছাড়া দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডে পুল নামক স্থানে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে হাউই দ্বীপপুঞ্জে এই ধরণের ধ্বনি জনক বালুকা আছে বলে জানা যায়।

সবশেষে রহস্যজনক এক বালির বিষয় বলব, যা জলে ডোবালেও ভিজবে না। একটি পরিষ্কার লোহার কড়া খুব উত্তপ্ত উনানের উপর স্থাপন করে তার মধ্যে প্রায় এক কিলোগ্রাম আন্দাজ বিশুদ্ধ বালি দিয়ে গরম করতে হবে। যখন এই তপ্ত বালির মধ্যে এক খণ্ড কাগজ দিলে বাদামীবর্ণ ধারণ করবে, তখন ওর ভেতর প্রায় ত্রিশ গ্রাম মোম ঢেলে দিয়ে নেড়ে চেড়ে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর উনুন থেকে ঐ কড়া নামিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা করলে সমস্ত বালিটা আগেকার মত ঝর ঝরে হয়ে ভেঙ্গে যাবে, কিন্তু এই বালি জলে নিমজ্জিত করলে কিছুতেই আর ভিজবে না। সকলেই এই বিস্ময়কর বালুকা দেখে বিশেষ আশ্চর্য্য হয়ে পড়বে। আসল কথা মোম মিশ্রণের ফলে প্রত্যেক বালির কণায় একটা সূক্ষ্ম তৈলাক্ত আবরণ পড়ে যার, যায় জন্য সেটি আর কিছুতেই জল সিক্ত হয় না।

"সাধনালয়", পুরুলিয়া রোড, রাঁচি

মজার ম্যাজিক স্কোয়ার

দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ম্যাজিক স্কোয়ার নামটা তোমরা কেউ কেউ শুনেছ হয়তো। এখন এই ম্যাজিক স্কোয়ারের ম্যাজিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। পাশের ছবিটার বিশেষত্ব লক্ষ্য কর। দেখছ, একটা বর্গাকার ঘরকে নটা ছোট ঘরে ভাগ করে 1 থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা এলোমেলো ভাবে সাজান আছে।

8	1	6
3	5	7
4	9	2

এক কাজ কর, ওপর নীচে পাশাপাশি আর কোণাকুনি সংখ্যাগুলো যোগ করে ফেল। কি দেখছ, প্রত্যেক বারই যোগফল 15 হচ্ছে, তাই না? একেবারে ম্যাজিকের মত না? আর সেই জন্যই তো এর নাম দেওয়া হয়েছে ম্যাজিক স্কোয়ার। এটা হল 3×3 (3 by 3) মাপের ম্যাজিক স্কোয়ার। এই রকম আরো নানান্ মাপের এবং শুধু যোগ নয় বিয়োগ, গুণ এবং ভাগেরও ম্যাজিক স্কোয়ার হতে পারে।

প্রায় চার হাজার বছর আগেই এই ধরণের স্কোয়ারের মধ্যে বিশেষ পদ্ধতিতে সাজান সংখ্যাগুলির বিশেষত্ব আবিষ্কৃত হয়, কিন্তু তখন এই স্কোয়ারকে ধর্মীয় নকশা এবং যাদুবিদ্যার কাজে ব্যবহার করা হত। প্রাচীন কাল থেকেই এই ম্যাজিক স্কোয়ারের যাদু মানুষের মন জয় করেছে। খৃষ্ট পূর্ব 2200 সালে চীনে এর প্রচলন ছিল। ভারতবর্ষে ঠিক কোন সময়ে ম্যাজিক স্কোয়ারের প্রচলন হয়েছিল জানা যায় না, কিন্তু ইউরোপে 15শ শতাব্দী নাগাদ্ এই ম্যাজিক স্কোয়ার প্রথম আলোড়ন তোলে।

এই রকম একটা ম্যাজিক স্কোয়ার নিজে করতে পারলে খুব খুশী হতে তাই না? ব্যাপারটা কঠিন নয় মোটেই। এখানে তোমাদের বিজোড় সংখ্যক ঘরের অর্থাৎ 3×3, 5×5, 7×7 ইত্যাদি আকারের ম্যাজিক স্কোয়ার তৈরীর কৌশলটা জানিয়ে দিই। ম্যাজিক স্কোয়ারে যে ক'টা সারি, প্রত্যেক সারিতে ঠিক ততগুলোই ঘর 7×7 মাপের স্কোয়ারে ঘরের সংখ্যা 49, 13×13 তে 169। এখন মোট ঘরের সংখ্যা যে মাপের স্কোয়ারে যত 1 থেকে ঠিক ততগুলো সংখ্যা একটা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে বসালেই তৈরী হবে ম্যাজিক স্কোয়ার।

প্রথমে ওপরের সারির মাঝের ঘরে 1 বসাও। এবার পরের সংখ্যাগুলি বসিয়ে যাও বাঁ দিক থেকে ডান দিকে কোনাকুনি আর ওপরের দিকে। মনে রাখবে, 1. কোনাকুনি যেতে গিয়ে যদি স্কোয়ার ছাড়িয়ে মাথায় চলে যাও (2 বসাতে গিয়েই হবে) তাহলে পরের সংখ্যাটি বসাও একেবারে নীচের সারির সোজাসুজি ঘরটায়। এখানে কিন্তু মূল নিয়মটাই খাটছে। ছবি দেখ;

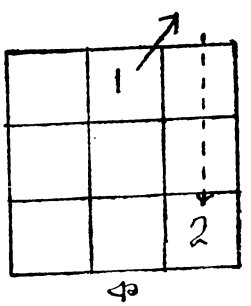

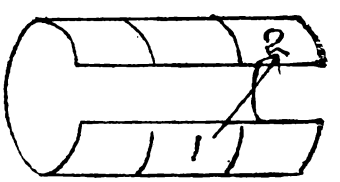

2. স্কোয়ার ছাড়িয়ে পাশে চলে গেলে ফিরে আসবে ঐ সারির প্রথম ঘরটায় (উপরের ছকে 3 বসাতে গিয়ে হয়েছে)। ছবি দেখ,

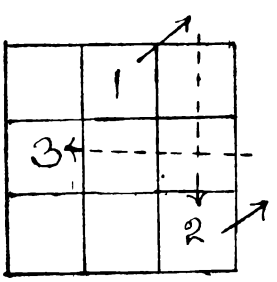

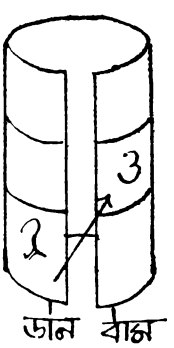

3. আর কোনাকুনি যেতে গিয়ে যদি এমন একটা ঘরে গিয়ে পড় যেখানে অন্য একটা সংখ্যা আগেই বসে গেছে (উপরের ছকে 4 বসানর ক্ষেত্রে), কিংবা স্কোয়ার

ছাড়িয়ে কোনাকুনি বেরিয়ে যাও (উপরের ছকে 7 বসানর ক্ষেত্রে) তাহলে চলে এসো আগের সংখ্যাটির ঠিক নীচে। ছবি দেখ,

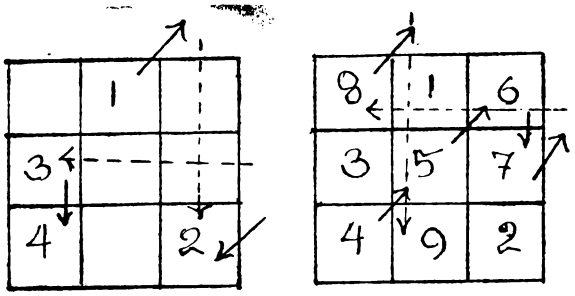

যাতে আরো ভালো করে বোঝ তাই একটা 5×5 মাপের স্কোয়ার তৈরী করে দেওয়া হল। ভাল করে শিখে তৈরী করে ফেল 7×7, 9×9 বা, 25×25 মাপের ম্যাজিক স্কোয়ার।

লক্ষ্য কর, ম্যাজিক স্কোয়ারে 1 থেকে x^2 (x = যে কোন বিজোড় সংখ্যা) পর্যন্ত সংখ্যা একবার মাত্রই ব্যবহার করা হচ্ছে। আর উপর নীচে, পাশাপাশি, কোনাকুনি সাজান সংখ্যাগুলির যোগফল,

$\frac{1}{2}(x^3+x)$→ এখানে x স্কোয়ারটির রো বা কলমের সংখ্যা।

অর্থাৎ 3×3 মাপের ম্যাজিক স্কোয়ারে ক্ষেত্রে,

$\frac{1}{2}(3^3\times3)=\frac{1}{2}\times30=15$

5×5 মাপের ম্যাজিক স্কোয়ারের ক্ষেত্রে,

$\frac{1}{2}(5^3+5)=\frac{1}{2}\times130=65$

আরো একটা মজার ব্যাপার পরীক্ষা করে দেখো। ম্যাজিক স্কোয়ারের সব কটি ঘর থেকে যদি একই সংখ্যা যোগ বা বিয়োগ করা হয় তাহলেও স্কোয়ারটি ম্যাজিক স্কোয়ার থাকবে। এতো গেলো বিজোড় মাপের ম্যাজিক স্কোয়ারের কথা। জোড় মাপেরও ম্যাজিক স্কোয়ার তৈরী হতে পারে। কিন্তু তা তৈরীর নিয়ম আলাদা এবং জটিল। উদাহরণ হিসেবে একটা জোড় মাপের (4×4) ম্যাজিক স্কোয়ার দেওয়া হল। সাধারণ ম্যাজিক স্কোয়ারের সমস্ত বৈশিষ্ঠ্যই এতে আছে। কারণ ওপর নীচ, পাশাপাশি বা কোনাকুনি যোগ করলে সব সময়েই 34 হবে, সূত্রানুযায়ী $\frac{1}{2}(4^3+4)=\frac{1}{2}\times68=34$

17	24	1	8	15
23	5	7	14	16
4	6	13	20	22
10	12	19	21	3
11	18	25	2	9

এছাড়া আরো অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে এর। যেমন, এখানে গায়ে গায়ে লেগে থাকা 2×2 মাপের বর্গের যে কোন একটির আলাদা ভাবে যোগফল 34।

যেমন, $1+14+4+15=6+9+16+3$

$=7+9+6+12=16+3+2+13=34$

1	14	7	12
15	4	9	6
10	5	16	3
8	11	2	13

এই রকম 2×2 মাপের কোন স্কোয়ার আলাদা করার সময় বেছে নেওয়া ঘর চারটি যদি গায়ে গায়ে না হয়ে সমান দূরে হয় (যেমন, $1+12+13+8$, $15+9+2+8$, $14+12+5+3$ ইত্যাদি) কিংবা পাশাপাশি আর ওপর নীচ এই দুদিকের যে কোন এক দিকে গায়ে গায়ে লেগে থাকা কিন্তু অন্যদিকে তিন ঘর দূরে হয় (যেমন, $1+14+8+11$, $14+7+11+2$ ইত্যাদি, কিংবা $1+15+12+6$, $10+8+3+13$ ইত্যাদি) তাহলেও যোগফল 34ই হয়। আর সব চেয়ে মজার ব্যাপার, স্কোয়ারটির বাঁ দিকে কি ডান দিকে, কিংবা ওপরে কি নীচে যদি বর্গটি পাশাপাশি লেখা হয় আরও একবার তাহলে 4×8 বা, 8×4 মাপের ছক থেকে গায়ে গায়ে লেগে থাকা যে কোন 4×4 মাপের স্কোয়ার আলাদা করলে সেটিও হয়ে যাবে আর একটি ম্যাজিক স্কোয়ার। পরীক্ষা করে দেখবে।

এই রকম আছে, বিয়োগ, গুণ আর ভাগেরও ম্যাজিক স্কোয়ার। অজস্র মজা ছড়িয়ে আছে এর প্রত্যেক অংশে। ম্যাজিক স্কোয়ার এক মজার ম্যাজিক।

260/1, সারকুলার রোড, শিবপুর, হাওড়া-2

পরিচিত গাছ আকন্দ

গোপাল চন্দ্র দাস

পৃথিবীর ভাঁড়ারে সঞ্চিত শক্তির যে সব উৎসগুলি রয়েছে তাতে আজ টান পড়েছে। তাই বিজ্ঞানীরা নতুন কিংবা পুনরনবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসের সন্ধান করে চলেছেন। এ বিষয়ে আমাদের আশেপাশে আকন্দ (Colotropis Procera R. Br) নামে যে আগাছা রয়েছে সেটি নিয়ে—যোধপুর সেন্ট্রাল অ্যারিড জোন রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটে (Jodhpur Arid Zone Research Institute) সম্প্রতি এক গবেষণা হয়েছে। তাতে আকন্দ গাছকে পেট্রোলিয়ামের একটি উৎসরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

আকন্দগাছ কে-না চেনে। আমাদের মতো যারা গ্রাম অঞ্চলে বাস করেন তাঁরা তাঁদের বাড়ীর আশেপাশে হামেশায় এই গাছ দেখতে পান। পুকুরের ধার রাস্তার ধার ঝোঁপ জঙ্গল নদীর ধার প্রভৃতি পতিত শুকনো জমিতে এদের বাস। অবশ্য একে গাছ না বলে গুল্ম বলা উচিত, কারণ এরা 1 মিটার থেকে 25 মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। এদের ফুলগুলি হয় পাটল রঙের (Pink) এবং তাতে বেগুনে রঙের দাগ থাকে। ফুলগুলির একরকম সুগন্ধ ও আছে। ভারতের উষ্ণ অঞ্চল ছাড়াও আফগানিস্থান, পারস্য, ইজিপ্ট এবং আফ্রিকার উষ্ণ অঞ্চলে এই উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যায়। এরা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে-এক-মাসে প্রায় একমিটার লম্বা হয়ে যায়। পরীক্ষায় জানা গেছে যে আকন্দগাছের বৃদ্ধির জন্য জল বা সারের খুব একটা প্রয়োজন হয় না।

ভারতে এই গুল্মকে বিষাক্ত আগাছারূপে গণ্য করা হয়, কারণ এর দুধের মত সাদা রস (latex) চামড়া কিংবা মিউকাস মেমব্রেনের সংস্পর্শে এলে জায়গাটা জ্বালা করে এ ছাড়াও এটি হৃদযন্ত্রের পক্ষে বিষাক্ত। ক্ষতিকারক হলেও কিন্তু এই উদ্ভিদের উপকারী দিকও আছে। এর ছাল থেকে শক্ত সুতো তৈরী করা যেতে পারে। কাণ্ড ও মূল থেকে কাঠকয়লা প্রস্তুত হয়, ঔষধশিল্পে এর মূল, কাণ্ড, পাতা ও ফুলের ব্যবহার আছে। আকন্দের বীজের সঙ্গে সূক্ষ্ম ও চিকন একধরণের ছোট ছোট রেশমের মতো তন্তু থাকে যা বিছানা বালিশ প্রভৃতি তৈরীর জন্য ব্যবহার করা চলে। এ সব ছাড়াও বর্তমান পরীক্ষায় একটি চমকপ্রদ সংবাদ পাওয়া গেছে—আকন্দ পুণরনবীকরণের যোগ্য হাইড্রোকার্বনের একটি ধনী উৎস। এই উদ্ভিদের সমস্ত অংশেই নিষ্কাশন যোগ্য হাইড্রোকার্বন যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। এর হেমান নির্যাস (hexan extroct) থেকে 78·03% কার্বন, 11·22% হাইড্রোজেন এবং 10·7% অক্সিজেন পাওয়া যায়। এই হাইড্রোজেন ও কার্বনের অনুপাত অশোধিত তেল, জ্বালানী তেল কিংবা গ্যাসোলিনের সমান। সেইজন্য আকন্দের হাইড্রোকার্বন পেট্রোলিয়ামের উৎস হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

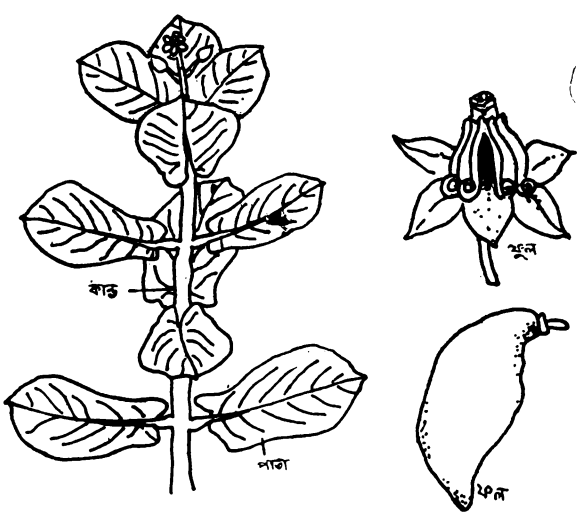

যেহেতু আকন্দ অযত্নেও তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে এবং এতে যথেষ্ট পরিমাণ হাইড্রোকার্বন ও তন্তু পাওয়া যায় সেইজন্য ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি সমস্যায় আকন্দ কিছুটা আশার আলো দেখায়।

গ্রাম ও পোঃ ঘোড়শালা, মুর্শিদাবাদ।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়োজিত

রচনা প্রতিযোগিতা

মান ঃ নবম ও দশম শ্রেণী

প্রথম পুরস্কার 40টা. দ্বিতীয় 30টা. তৃতীয় 20টা.

বিষয় সূচী

প্রবাসে ভারতীয় বিজ্ঞান—শব্দ সংখ্যা 400

নিয়মাবলী

* মার্জিনসহ পৃষ্ঠার একদিকে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে রচনা লিখে পাঠাতে হবে।

* নীচের কুপনটি পূরণ করে রচনার সঙ্গে পাঠাতে হবে।

* প্রেরিত রচনা ফেরত পাঠানো সম্ভব হবে না।

পুরস্কৃত রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হবে।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের দপ্তরে রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ 30 এপ্রিল 1984.

প্রতিযোগীর নাম..... .....বয়স .....

ঠিকানা.....

বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা .....

শ্রেণী... .....রচনা বিষয়.....

প্রতিযোগীর স্বাক্ষর

প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার স্বাক্ষর.....

মান ঃ ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী

প্রথম পুরস্কার 30টা. দ্বিতীয় 25টা. তৃতীয় 20ট.

বিষয় সূচী

বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার—শব্দ সংখ্যা 400

নিয়মাবলী

মার্জিনসহ পৃষ্ঠার একদিকে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে রচনা লিখে পাঠাতে হবে।

* নীচের কুপনটি পূরণ করে রচনার সঙ্গে পাঠাতে হবে।

* প্রেরিত রচনা ফেরত পাঠানো সম্ভব হবে না।

পুরস্কৃত রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হবে।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের দপ্তরে রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ 30 এপ্রিল 1984.

প্রতিযোগীর নাম..... বয়স .....

ঠিকানা.....

বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা.....

শ্রেণী..... রচনার বিষয়.....

প্রতিযোগীর স্বাক্ষর .....

প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার স্বাক্ষর.....

অতলান্তিক মহাসাগরে সাঁতার কাটতে কাটতে নটিলাস এসে পড়লো গলফ স্ট্রীমে। নেড এবার বাড়ী ফেরার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলো।
কয়েকদিন পরেই নটিলাস আমার দেশের পাশ দিয়ে যাবে। ভাবলেই মাথাটা গরম হয়ে যায় অধ্যাপক। আপনাকে বলে রাখছি, আমি বরং সমুদ্রে ঝাঁপ দেবো, তবু এখানে আর থাকবো না।
চলো নেড, আমাদের নিয়ে ক্যাপ্টেনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা কী, একটু জেনে আসি।
দেখুন অধ্যাপক, এই পাণ্ডুলিপিতে আমার সমুদ্রচর্চা আর জীবনী লিখে রেখেছি।
আমি ঠিক করেছি, আমাদের শেষ জীবিত মানুষটি এটিকে বাক্সবন্দী করে সমুদ্রে ফেলে দেবে, তারপর ভেসে ভেসে চলে যাবে যেখানে খুশী।
বন্ধ মেকেলে পরিকল্পনা ক্যাপ্টেন। তার চেয়ে যদি আমাদের মুক্তি দেন, আমরা বিশ্ববাসীর কাছে এটির প্রচার করতে পারি।
মুক্তি? এ প্রশ্নের উত্তর সাত মাস আগে যা দিয়েছি, আজও তাই দেবো অধ্যাপক।
রাগে ফেটে পড়লেন ক্যাপ্টেন নিমো।
এই অবস্থায় নৌকা নিয়ে পালানোর চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।
লং আইল্যাণ্ডের কোল ঘেঁষে এগিয়ে চললো নটিলাস। আকাশে মেঘ জমতে জমতে একসময় ঝড় উঠলো প্রচণ্ড।
45

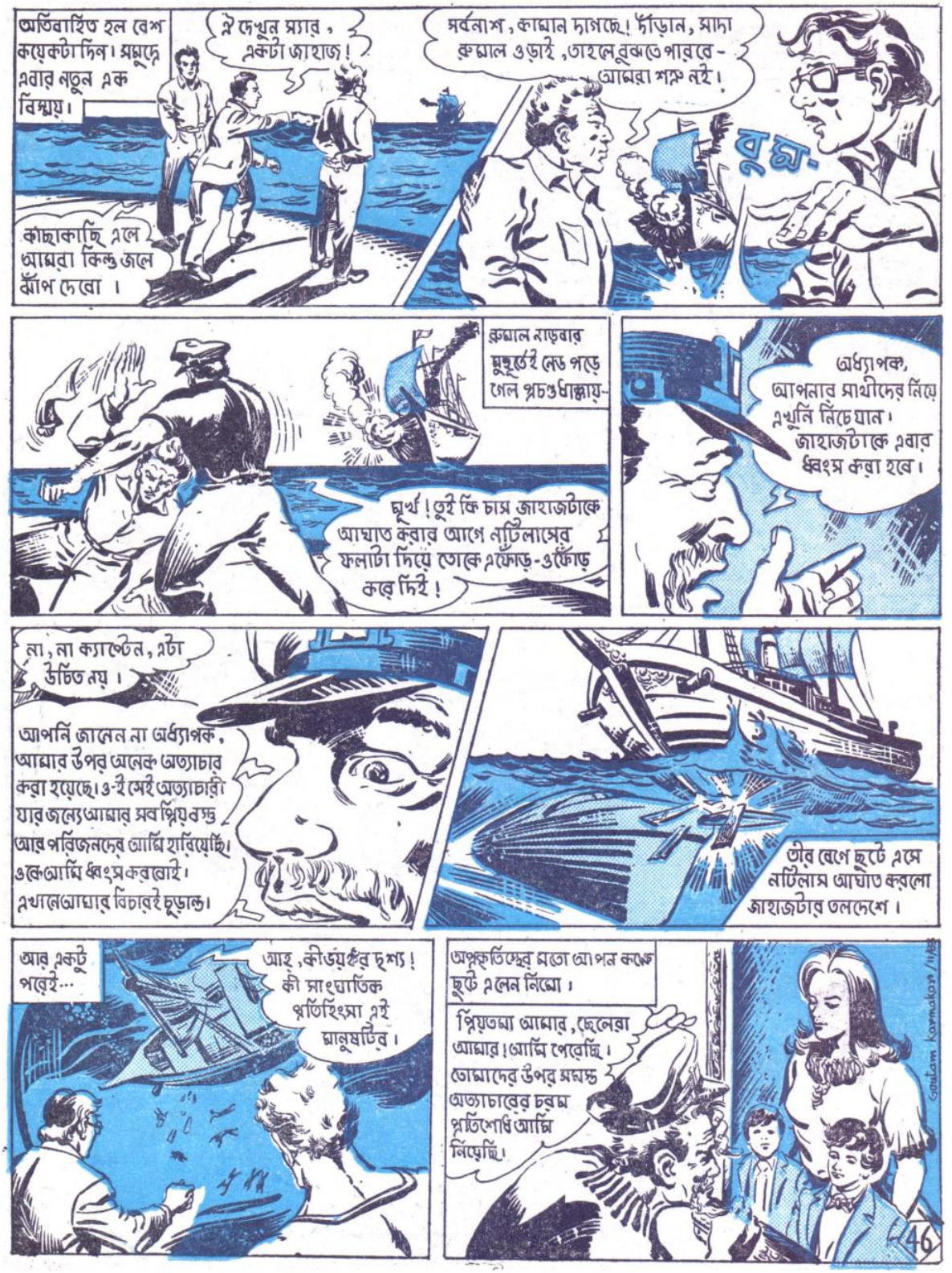

টোয়েন্টি থাউজেণ্ড লীগস্‌ আণ্ডার দি সী

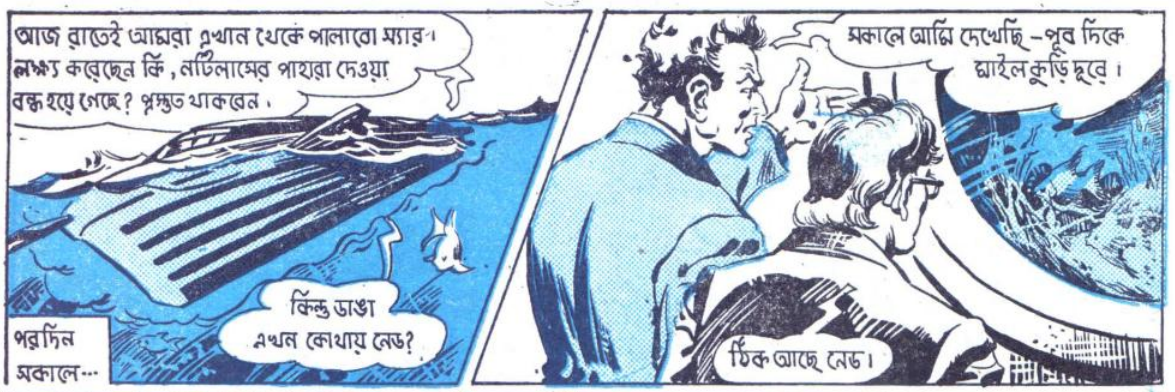
আজ রাতেই আমরা এখান থেকে পালাবো স্যার। লক্ষ্য করেছেন কি, নটিলাসের পাহারা দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে? প্রস্তুত থাকবেন।
পরদিন সকালে...
কিন্তু ডাঙা এখন কোথায় নেড?
সকালে আমি দেখেছি—পূব দিকে হাইল কুড়ি ঘুরে।
ঠিক আছে নেড।

শেষবারের মতো নটিলাসের জানলা দিয়ে অধ্যাপক তাকালেন
আমি ভাগ্যবান। প্রকৃতির কী অফুরন্ত সম্ভার আমি এতদিন ধরে দেখে গেলাম। এই অনন্ত রাজ্যের স্মৃতি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্ভার।
ক্যাপ্টেনের ঘরের কাছে অধ্যাপক মুহূর্তের জন্যে থামলেন।
আহ্! কী করুণ অর্গানের সুর! একটা মানুষ যেন পৃথিবীর সব বন্ধন ছিন্ন করে আর কোথাও চলে যেতে চাইছে।

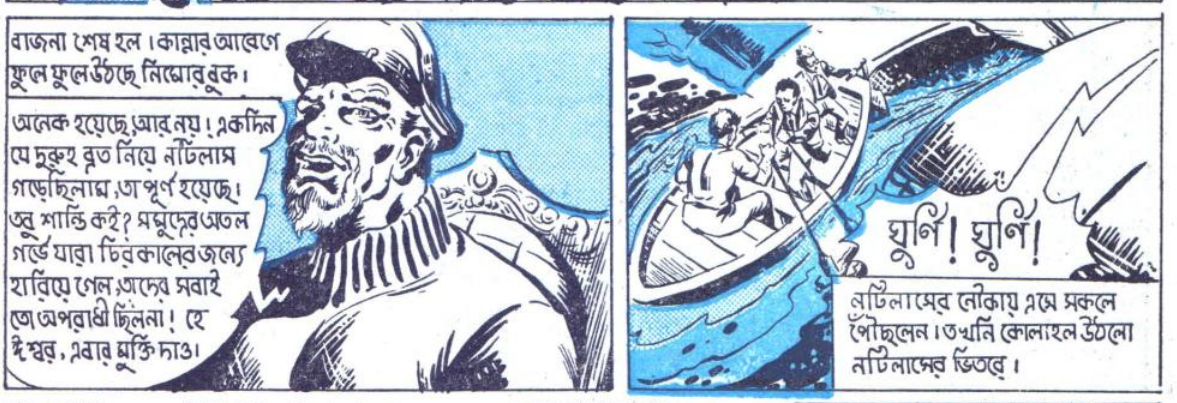
বাজনা শেষ হল। কান্নার আবেগে ফুলে ফুলে উঠছে নিমোর বুক।
অনেক হয়েছে, আর নয়! একদিন যে দুরুহ ব্রত নিয়ে নটিলাস গড়েছিলাম, তা পূর্ণ হয়েছে। তবু শান্তি কই? সমুদ্রের অতল গর্ভে যারা চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেল, তাদের সবাই তো অপরাধী ছিলনা! হে ঈশ্বর, এবার মুক্তি দাও।
ঘুর্ণি! ঘুর্ণি!
নটিলাসের নৌকায় এসে সকলে পৌঁছলেন। তখনি কোলাহল উঠলো নটিলাসের ভিতরে।

চারপাশ থেকে দুহু শব্দে ছুটে আসছে বিরাট ঢেউ। সমুদ্রের মাঝখানে এসে সেই জলরাশি প্রবল বেগে ঘুর্ণিত হচ্ছে।
এ কী বিপত্তি! হা ঈশ্বর!
41

ঘূর্ণির প্রচণ্ড তাণ্ডব
এসে ঘিরে ধরলো নটিলাসকে। পলাতক তিন আরোহীকে নিয়ে নৌকাটা তখন স্রোতের টানে ছুটে চলেছে। হঠাৎ কড় কড় একটা শব্দ...
একটা লোহার টুকরো এসে অধ্যাপকের মাথার উপর পড়লো। তিনি জ্ঞান হারালেন।
অধ্যাপকের জ্ঞান যখন ফিরলো...
আমি কোথায়?
আমাদের কুটিরে। আমরা জেলে, আপনাদের উদ্ধার করে এনেছি হুজুর।
ভালো বোধ করছেন তো স্যার?
হ্যাঁ, এ যাত্রায় শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেলাম।
নটিলাসও কি রক্ষা পেয়েছে? নিমো কি এখনো বেঁচে আছেন? সমুদ্রের অপার রূপ-রহস্য দেখেই যেন মুগ্ধ থাকেন তিনি। হে ঈশ্বর, তাঁকে শান্তি দাও এবার।
সমুদ্রের ধারে এসে অ্যারোনেক্স দাঁড়ালেন। এখন সমুদ্র শান্ত।
শেষ

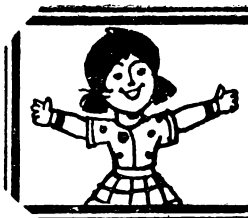

ছোটদের দপ্তর

পরিচালনায় জয়ন্ত দত্ত

'নলেজ ক্যুইজ' ফেব্রুয়ারী 84 সংখ্যার উত্তরদাতাদের নাম

তোমাদের আগেও বলা হয়েছে, আবার বলা হচ্ছে, প্রতি মাসের 15 তারিখের মধ্যে যদি নলেজ কুইজের উত্তর দপ্তরে এসে না পৌঁছয় তাহলে উত্তরদাতাদের নামের তালিকায় তোমাদের নামের সংযুক্তি সম্ভবপর হবে না।

গত ফেব্রুয়ারী, 84 নলেজ কুইজের বহু উত্তর অনেক দেরিতে আমাদের দপ্তরে এসে পৌঁচেছে। তার থেকে কিছু নাম আমরা তুলে দিলাম।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ মহঃ কদম রসুল, জামিউল হাসান, প্রহেসান হাসান, সুব্রত দে, মিতালি ভাণ্ডারী, শান্তনু ঘোষ, শুভাশিস বোস, রবিশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, পার্থপ্রতিম তরফদার, সন্তোষকুমার দাস, সুভাষচন্দ্র মাহাতো, গয়াসাগর মাঝি, স্বস্তি চ্যাটার্জী, সুভাষ দত্ত, মলয় মুখোপাধ্যায়, জয়শ্রী খাঁ, অর্ণব খাঁ, পুষ্পেন্দু চক্রবর্তী, কুন্তল দত্ত, সুদীপ্ত দাঁ, সুকান্ত দাঁ, জয়দীপ রায়, জয়শ্রী রায়, রজত ভট্টাচার্য, মনোমোহন টুণ্ডু, পূর্ণেন্দু খাঁ, বিজয়কুমার গরাই, অমিত মহাপাত্র, অরিন্দম ঘোষ, অরূপকুমার রায়, নমিতা প্রামাড়িক, সরোজ দাসচৌধুরী, নবদীপিকা পান, শুভাশিস দত্তপাণ্ডে, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপকরঞ্জন রাম, পার্থ তেওয়ারী, রাখী সিনহা, সব্রত ব্যানার্জী জয়দীপ ঘোষাল, অরূপ ঘোষ, তাপসকুমার ঘড়ুই, দেবকুমার সরকার, সঞ্জয় সামন্ত, তাপস গলুই, বীণা সাহা, মধুমিতা সিনহা, শ্রাবণী রথ, সৈকত প্রসাদ রায়, তনুজা হালদার, শৈবাল ঘোষ, ব্রজগোপাল সাবুই, নির্মাল্য মুখার্জী, প্রহ্লাদ ভৌমিক, তপনকুমার গড়াই, সঞ্জয়কুমার চৌরাসিয়া, অশোককুমার দে, প্রীতম ব্যানার্জী, রবীন্দ্রনাথ জানা, অলোকরঞ্জন মণ্ডল, প্রবীর দাস, প্রণব, আশিস দে, তন্দ্রা গোস্বামী, সৈয়দ আবদুল ওয়াসিস, করবী, মাধবী, পুরবী ঘোষ, মৃণাল রক্ষিত, সংলাপনিচয় দিন্দা, কল্যাণকুমার সামন্ত, অসিতকুমার হালদার, সন্দীপ, ভদ্র, অংশুমান চৌধুরী, রাজদীপ ঘোষ, মিলি ভট্টাচার্য, শেখ মহম্মদ মহসীন, শেখ মহম্মদ ফারুক, শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, পিনাকী মুখার্জী, অনিন্দ্য ব্যানার্জী, সস্মিতা সাহা, অঞ্জন ব্যানার্জী, ষোড়শী চক্রবর্তী, সুধাংশু মণ্ডল, চণ্ডল রায়, নীলকলল মাহাতো, গৌতম দাস, মানব প্রধান।

বিহার ঃ তুলিকা পাল, তঞ্জয় চক্রবর্তী।

আসাম ঃ রোজীনা সুলতানা, সৌন্দর্য্য বল, মাধুর্য্য বল, দেব দেউল বল, দেবজিৎ দত্ত, আমিন উল্লাহ আহমেদ, গৌরীশঙ্কর দাস।

বাংলাদেশ ঃ এস. কে. বাবুল।

মার্চ 84 নলেজ ক্যুইজের যারা সব কটি প্রশ্নের উত্তর সঠিক দিয়েছে

কলকাতা ঃ প্রণবকুমার সরকার, সুপর্ণা সরকার, রুমকি সরকার, শুভ্রাংশু বিশ্বাস, হিমাদ্রিশেখর আদিত্য চৌধুরী।

24-পরগণা ঃ মৃণালকান্তি ভট্টাচার্য্য।

হুগলী ঃ অনুসীমা শীল, যমুনা শীল, স্বপনকুমার পল্যে, অভিজিৎ দত্ত, মনজিৎ দত্ত।

নদীয়া ঃ অচিন্ত্য চক্রবর্ত্তী।

বর্ধমান ঃ কৃষ্ণচন্দ্র মণ্ডল, সুজয় কুমার হালদার, হরিপদ দাস, তুষারকান্তি চক্রবর্তী, পার্থসারথি মণ্ডল, সোমেশ্বর চৌধুরী, সুজয় হালদার, শেখ নূরউদ্দিণ, আবাস উদ্দিন, গৌতম বসু, সোমেশ্বর দাস, খন্দোকার মহম্মদ হোসিব। **মেদিনীপুর ঃ** মধুমিতা সিনহা।

মার্চ 84 নলেজ ক্যুইজের দশ বা তার বেশি সঠিক উত্তরদাতাদের নাম

কলকাতা ঃ শুভ্রজিৎ কর, মিতা মণ্ডল, রমা মণ্ডল, গৌতম মণ্ডল, অরুণাভ ব্যানার্জী, শান্তনু দত্ত।

24-পরগণা ঃ অনুকূলচন্দ্র পাল, নিরঞ্জনকুমার রায়, শ্যামলকুমার গোড়ে।

হাওড়া ঃ দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, কাজল রীত।

হুগলী ঃ ভাস্কর ঘোষ।

বর্ধমান ঃ সুমন চক্রবর্তী, সুধাময় চক্রবর্তী ও অন্যান্য, ধর্মদাস চন্দ্র, অরূপকুমার মল্লিক, গৌতম মজুমদার, শুভজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজ্যোতি পানি, সিদ্ধার্থশঙ্কর ব্যানার্জী।

মেদিনীপুর ঃ মনীন্দ্রনাথ মণ্ডল, সুধাংশু মণ্ডল, নীতিস পাড়ুই।

নদীয়া ঃ সুজিতকুমার খাঁ, পল্টু চক্রবর্তী, বাসুদেব পাকড়াশী, কানু পাকড়াশী, শান্তনু চক্রবর্তী, পার্থপ্রতিম বসু, সব্যসাচী বসু, দেবাশীশ দাস, প্রসেনজিৎ বসু।

বীরভুম ঃ দীপনারায়ণ দত্ত, মালা দত্ত, সুদীপ্ত দত্ত।

বাঁকুড়া ঃ শ্যামসুন্দর সাহা, আলোমণি সাহা ও অন্যান্য।

পঃ দিনাজপুর ঃ প্রদীপকুমার ঘোষ।

নলেজ ক্যুইজ

[উত্তর এপ্রিলের 15 তারিখের মধ্যে দপ্তরে পৌঁছানো চাই। দশ বা তার বেশী সঠিক উত্তর দাতাদের নাম পরের সংখ্যায় ছাপা হবে।]

1. দিয়েগো গারসিয়া দ্বীপ কোন্ মহাসাগরে অবস্থিত ?
2. নীচে কিসের ছবি এবং এর নাম কি ?

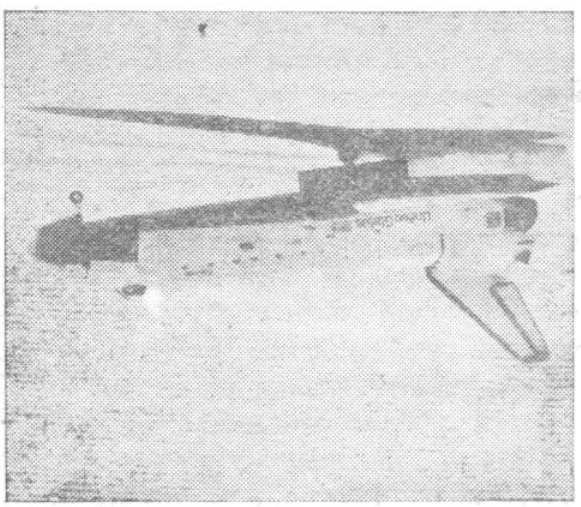

3. কোন্ দেশকে-বিশ্বের 'চিনির পাত্র'আখ্যা দেওয়া হয় ?
4. 'বাস্টার্ড কিং' প্রাণি ভারতের কোন্ রাজ্যে দেখা যায় ?
5. লোকসভার সদস্য হতে হলে কমপক্ষে কত বয়স হওয়া প্রয়োজন ?
6. 1980 সালে 'ভারত রত্ন' উপাধি লাভ করেন কে ?
7. তেইশতম অলিম্পিক কবে কোথায় হবে ?
8. বলশেভিক বিপ্লব পরিচালনা করেছিলেন কে ?
9. খাদ্যজাত শক্তিকে কোন্ এককে প্রকাশ করা হয় ?
10. ভারতে কত বছর অন্তর জনসংখ্যা গণনা করা হয় ?
11. Histone কি জিনিস ?
12. রেফ্রিজারেটরের ভিতরের উষ্ণতা স্থির রাখা হয় কোন্ যন্ত্র দ্বারা ?
13. ভারতের কোথায় ভাইরাস গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত ?
14. ভারতের প্রথম তৈল শোধনাগারটি কোথায় স্থাপিত হয় ?

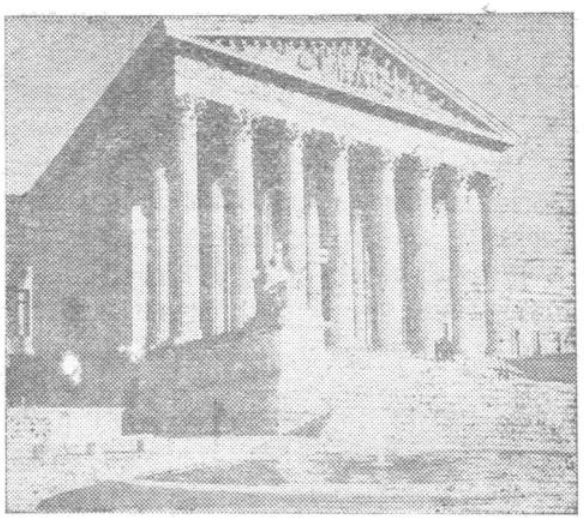

15. উপরের ছবিটি কিসের, বলতে পার ?

(সমাধান পরবর্তী সংখ্যায় থাকবে)

নলেজ ক্যুইজ গত সংখ্যার সমাধান

(1) শ্যুটিং (2) বল্লাল সেন (3) পরমাণু ক্রমাংকের উপর (4) ভিটামিন-C (5) গোল্ড কোস্ট (6) লাহোরের তালবন্দী গ্রামে (7) পাঞ্জাব (8) চা (9) 1800 খ্রীষ্টাব্দে (10) হংকং বিমান সংস্থা (11) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (12) সাভানা (13) শ্যাম দেশ (14) স্পেন (15) স্যার উইলিয়ম র‍্যামজে।

ভেবে ভেবে বল-র উত্তর

1. (A) পেনিসিলিয়াম নোটেটাম, (B) ব্যাসিলাস। 2. (B) ফ্লাজেলা 3. গোল্ডেন প্লোভার 4. রেনিন।

প্রশ্নোত্তর

উত্তর দিয়েছেন ঃ সুনির্মল রায়

1. রেগুলেটর দ্বারা পাখার রোধ কমান বা বাড়ান হ'লে কি তড়িতের খরচের পরিমাণ কমে বা বাড়ে ?

—সুজন কুমার দাস, শেওড়াফুলি, হুগলী

উত্তর ঃ মিটারের মধ্যে অ্যালুমিনিয়ামের পাতলা ডিস স্বাধীনভাবে চক্রাকারে ঘুরতে পারে। ডিসটির ঘূর্ণন সংখ্যার উপর মিটার রিডিং নির্ভর করে। ঘুরন্ত ফ্যানের মধ্যে যে কারেণ্ট প্রবাহিত হয় তাকে লোড কারেণ্ট বলে।

বৈদ্যুতিক ফ্যানের সঙ্গে রেগুলার শ্রেণী সমবায়ে অর্থাৎ সিরিজে যুক্ত থাকে। ফ্যানেও রেগুলেটর লোড কারেণ্টের প্রবাহ বাধা দেয়। এই বাধাদানের ক্ষমতাকে তড়িৎরোধ বলে। যখন ফ্যান ফুলস্পীডে তখন ফ্যান রেগুলেটরের কার্যকরী তড়িৎ রোধের মান কম হয়। এক্ষেত্রে লোড-কারেণ্ট বেশী হবে, মিটারের ডিসটি দ্রুত ঘুরবে এবং মিটার রিডিং সময় সাপেক্ষ একটু বেশী হবে। রেগুলেটর ঘুরিয়ে ফুলস্পীড থেকে ফ্যানের স্পীড কমিয়ে দিলে ফ্যান ও রেগুলেটরের কার্যকরী তড়িৎরোধ বেড়ে যাবে। সুতরাং লোড কারেণ্টের মান অপেক্ষাকৃত কম উঠবে। রেগুলেটর দ্বারা ফ্যানের স্পীড বাড়িয়ে কমিয়ে মিটারের মধ্যে চক্রাকারে ঘুরন্ত অ্যালুমিনিয়াম ডিসের কোন নির্দিষ্টসংখ্যক পূর্ণ ঘূর্ণনের সময় পরিমাপ করলেই উপস্থাপিত বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হবে।

অর্থাৎ এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর হ'লো, হ্যাঁ, রেগুলার দ্বারা পাখার রোধ কমান বা বাড়ান হ'লে তড়িতের খরচের পরিমাণ কমে বা বাড়ে।

2. আকাশের রং নীল কেন ?

—ননীগোপাল মণ্ডল, লালনগর, মেদিনীপুর

উত্তর ঃ সূর্যের আলোর সাতটি রঙ যাকে আমরা এক কথায় VIBGYOR বলি, তারা বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে এসে আমাদের চোখে পড়ে। আসবার সময় নীল ছাড়া অন্য কোন রঙ এমনভাবে প্রতিসারিত হয় যার ফলে আমাদের চোখে পৌঁছুতে পারে না। এই বিচ্ছুরণ এবং প্রতি-সরণের ফলে কেবলমাত্র নীল রঙ আমাদের চোখে পৌঁছায়। ফলে উপরটাকে অর্থাৎ আকাশকে আমরা নীল দেখি।

3. মানুষের ঘর্ম নোনতা কেন ?

—শ্রীবিষ্ণু বাসিয়া, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

উত্তর ঃ মানুষের ঘামে সাধারণতঃ সাধারণ লবণ থাকে যাকে আমরা রাসায়নিক Nacl অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইড নাম দিয়েছি। এর স্বাদ নোনতা বলে মানুষের ঘামের স্বাদও নোনতা।

4. চোখের জল এবং গায়ের ঘাম নোনতা কেন ? এই উভয় প্রকার জল কি একই ?

— পার্থ দাস, বেলগাছিয়া, হাওড়া-৮

উত্তর ঃ গায়ের ঘামে সাধারণ লবণ থাকে বলে গায়ের ঘামের স্বাদ নোনতা। তবে নোনতা স্বাদ হ'লেই যে সাধারণ লবন থাকবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অন্য কিছুও চোখের জলে থাকতে পারে যার স্বাদ নোনতা। তবে চোখের জলেও সাধারণ লবন থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সব উপাদানের কথা বিবেচনা করলে চোখের জল ও ঘামের জলকে এক বলা চলে না। কারণ ঘামের জলে যা যা উপাদান থাকে সেগুলোই সেইভাবে চোখের জলে থাকবে—একথা বলা চলে না।

5. প্রশ্ন ঃ আমাদের শরীরের কোনো অংশে কিছুটা কেটে গেলে বা ছড়ে গেলে রক্ত বার হয়। কিন্তু ইঞ্জেকশনের পুরো ছুঁচটা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করলে রক্ত বার হয় না কেন ?

রজত কুমার সামন্ত, লোকোপাড়া, ভোজুডি, ধানবান।

উত্তর ঃ ছুঁচ সূক্ষ্ম এবং ছেদ করা দেহাংশের কোনো শিরা ভেদ করে না এবং ছুঁচ বার করে নিলে ত্বকে কোন আঘাত লাগে না। তবুও ঠিক মতো ইঞ্জেকশনের ছুঁচ না ঢুকলে বা রোগী নড়ে চড়ে গেলে রক্ত বেরিয়ে যায়।

B. E. কলেজ, শিবপুর, হাওড়া।

সংখ্যাকূট

জয়জিৎ লাহিড়ী

গত সংখ্যার সমাধান

2	2	3	■	■	3	5	7
2	8	■	■	■	■	5	1
2	■	1	7	1	2	■	0
■	■	8	■	■	3	■	■
■	■	6	■	■	0	■	■
2	■	1	4	4	0	■	1
5	2	■	■	■	■	2	4
2	3	2	■	■	9	8	1

ময়লা আবর্জনাও ফেলনা নয়

বিপ্লব সরকার

আধুনিক শিল্প সভ্যতার অগ্রগতির চাকা ঘুরছে জ্বালানী শক্তির উপর ভিত্তি করে। কিন্তু এই শক্তির উৎস সীমায়িত। একদিন না একদিন ফুরিয়ে যাবে। হয়ত তখন সভ্যতার অগ্রগতির চাকা থেমে যাবে। অবশ্য সেটা কল্পনা প্রসূত। তাই জ্বালানী সংকট এড়াবার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীমহলে সাড়া পড়ে গেছে। বিজ্ঞানের বাহাদুরির তো অন্ত নেই—আবিষ্কৃত হল বৈদ্যুতিক চুল্লী (ইলেকট্রিক ফার্নেস), সৌর তাপ চুল্লী (সোলার হিট রেজিস্টর) ও সর্বশেষ পারমানবিক চুল্লী (অ্যাটমিক রি-অ্যাক্টর) অবশ্য এগুলি তাপ শক্তির উৎস। হ্যাঁ, জ্বালানী সম্পর্কে জানা দরকার। জ্বালানী কি? দাহ্য পদার্থকে জ্বালানী বলে। জ্বালানী প্রধানত দুপ্রকারের—প্রাকৃতিক জ্বালানী ও উৎপাদিত জ্বালানী। উদাহরণঃ কয়লা, পেট্রোলিয়াম, কেরোসিন, গ্যাসোলিন ইত্যাদি। এক ধরনের জ্বালানীর এক এক ধরনের ক্যালরিফিক মূল্য। বর্তমানে আমাদের দেশে জ্বালানীর সংকটময় অবস্থা। অনেক শিল্পের অকাল মৃত্যু চলছে। ভারতে প্রযুক্তি-বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে বিস্তর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা যারা ক্ষুদে বিজ্ঞানী, তারা নানা বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে বা বিজ্ঞানের আলোচনা চক্রে এ নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করি। একটু ভেবে দেখলে বুঝতে পারা যাবে যে ময়লা বা দূষিত আবর্জনা আমরা যা ফেলনা মনে করে ফেলে দিই সেগুলো কিন্তু আদৌ ফেলনা নয়। সেগুলি দিয়ে জ্বালানী সমস্যার একটা সমাধানের সূত্র পাওয়া যেতে পারে।

দাহ্য গ্যাস হিসাবে মিথেনের (CH_4) জ্বালানী মূল্য যথেষ্ট। গ্যাসটা শুধু যে কয়লা খনি বা পেট্রোলিয়ামের খনির নিকটবর্তী অঞ্চলে পাওয়া যায়, তা নয়, পয়—প্রণালী মলমূত্র বিবিধ আবর্জনা, গোবর প্রভৃতি পচে মিথেন গ্যাসের সৃষ্টি হয়। অনেক দেশের শহরাঞ্চলে এ সব দূষিত আবর্জনাদি থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থায় গ্যাস উৎপাদন করে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। উৎপন্ন গ্যাসের শতকরা 70-80 ভাগই থাকে মিথেন গ্যাস। পাশ্চাত্যের বড় বড় শহরগুলিতে এরূপ গ্যাসোৎপাদনের কেন্দ্রে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ ঘনফুট এই গ্যাস উৎপাদিত হয়ে থাকে এবং জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার হয়।

কলকাতা ভারতের একটি বৃহত্তর শিল্পাঞ্চল। এখানেও জ্বালানীর বহুল ব্যবহার। সংকটময় পরিস্থিতির মুখোমুখি। সংকট উত্তরনের জন্য সঠিক ব্যবস্থা না নিলে কলকাতা শিল্পাঞ্চল বিপর্যয়ের মুখে ঢলে পড়বে। কলকাতার বিপুল পরিমাণ আবর্জনাদি থেকে ধাপা অঞ্চলে এরূপ গ্যাসোৎপাদনের কথা প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় খরচের কথা ভেবে পৌরসংস্থা দ্বিধাগ্রস্ত। কিন্তু একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে যে একবার এরূপ গ্যাসোৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করতে পারলে শেষে সম্পূর্ণ নিঃ খরচায় অনায়াসে বিপুল পরিমাণ গ্যাস উৎপাদন করা যেতে পারে। কারণ একটাই—এরতো কাঁচা মালের অভাব নেই। প্রতিদিন হাজার হাজার টন দূষিত আবর্জনা ও দূষিত পদার্থ পাওয়া যায়, যা বর্তমানে ধাপায় অপসারিত হচ্ছে। আমাদের দেশের পক্ষে মিথেন গ্যাসের অপচয় নিবারনে তৎপর হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা এটি কেবল জ্বালানীই নয়, কার্বন ব্লাক, হাইড্রোজেন, মেথানল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উৎপাদনের বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্প সহজে গড়ে তোলা যায়। এতএব রসায়নের দৃষ্টিতে দূষিত আবর্জনাও যথেষ্ট মূল্যবান।

C/o অধীপ সরকার
সুকান্তপল্লী, গুমা, ২৪ পরগণা

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (1956)-8 ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হল।

1. প্রকাশস্থানঃ 8/1A, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—700 073।

2. প্রকাশকালঃ মাসিক।

3. প্রকাশক ও মুদ্রাকরঃ রবীন বল, ভারতীয় নাগরিক, 8/1A, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-700 073

4. সম্পাদকঃ রবীন বল, ভারতীয় নাগরিক, 8/1A, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-700 073।

5. যে সকল ব্যক্তি এই পত্রিকার মালিক এবং যাঁরা মোট মূলধনের এক শতাংশেরও অধিক অংশীদার বা শেয়ার গ্রহীতা, তাঁদের নাম ও ঠিকানাঃ

(ক) মালিকঃ রবীন বল, 8/1A, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট. কলিকাতা-700 073।

(ঘ) মোট মূলধনের এক শতাংশেরও অধিক অংশীদারঃ রবীন বল, 8/1A, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-7000 073।

আমি রবীন বল এত দ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(স্বাঃ) রবীন বল

এপ্রিল 1984, প্রকাশক

ভেবে ভেবে বল

নবীগোপাল মণ্ডল

1. নিচে একটি ছত্রাক (A) ও একটি ব্যাকটিরিয়ার (B) ছবি আছে এদের নাম কি বলো।

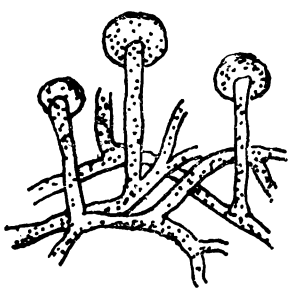

বাঁ দিকের ছবি : A

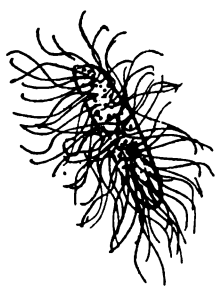

ডান দিকের ছবি : B

2. ইউগ্লিনার গমনাঙ্গের নাম :

(A) সিলিয়া (B) ফ্লাজেলা (C) ক্ষণপদ।

3. নীচের ছবিটি একটি যাযাবর পাখির।

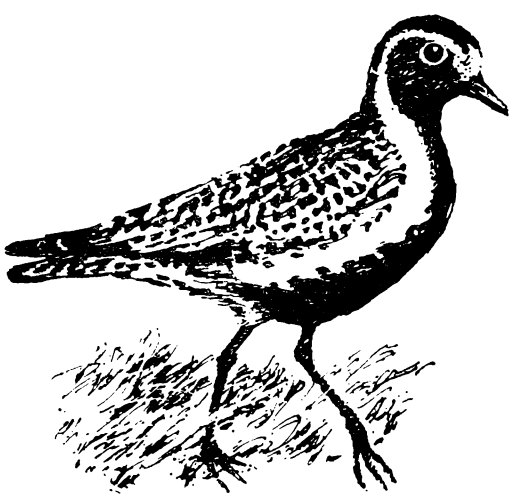

যে এক নাগাড়ে 3200 কিলোমিটার উড়তে পারে। এদের ভারতেও দেখা যায়। বল তো এটির নাম কি?

4. মানুষের পাকস্থলিতে দুগ্ধ প্রোটিনের উপর কাজ করে পেপসিন/রেনিন/লাইপেজ এনজাইম। ভেবে বল।

বামনসরিষা, লালনগর, মেদিনীপুর।

রোবট-কূট

শুভেন্দু দাস

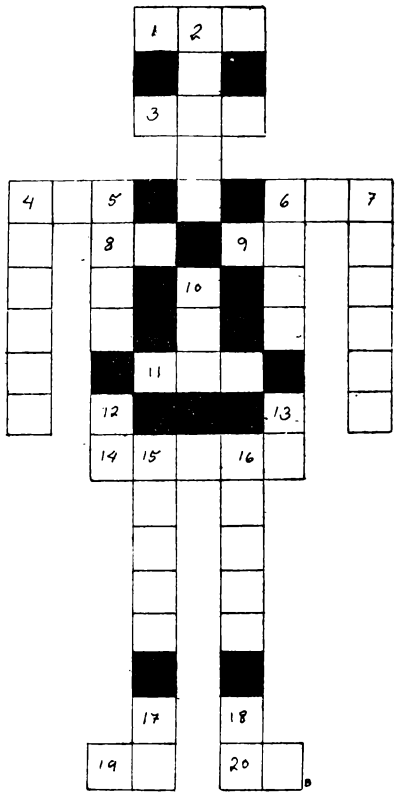

রোবট কূটের প্রশ্নাবলী :

পাশাপাশি :

1. পর্যায় সারণীর VIII শ্রেণীর একটি মৌল। 3. নদীর তীর। 4. বাড়ির ইংরাজী নাম। 6. এমন একটি ধাতু যাহার দ্বারা লোহার উপর প্রলেপ লাগানো হয়। 8. যাহার সাহায্যে ভারী মাল উপরে তোলা হয়। 9. একটি বৃক্ষ-বিশেষ। 11. বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুনে আছে। 14. Mg-এর একটি উৎস। 20. তরল যোগ কলা। 19. একটি মূল্যবান ধাতু।

উপর নীচ :

2. একটি অস্থায়ী মৌল। 4. নক্ষত্র-মণ্ডল ও একজন গ্রীক বীর। 5. বিখাত দার্শনিক। 6. বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। 7. যোজ্যতাহীন একটি মৌল। 10. একটি খনিজ পদার্থ। 12. সামুদ্রিক মৎস্য। 13. তন্তুজাত উদ্ভিদ। 15. গণিত শাস্ত্রের একটি শাখা। 16. একটি হর্মোন। 17. বিখ্যাত নারী জ্যোতির্বিদ। 18. সাবান শিল্পে ব্যবহৃত হয় এমন দ্রব্য।

পুরুলিয়া মিল হাইস্কুল।

বিকাশ বসাক

সেরিব্রাল ক্যাচার

সুব্রতকে সবাই পাগল বলে। নানা রকম উদ্ভট সব চিন্তা তার মাথায় ঘোরে। গভীর রাত্রে সেদিন হঠাৎ ঘুমের ঘোরে ইউরেকা ইউরেকা বলে চিৎকার করে উঠে। তখন থেকেই সে বলতে লাগল যে, সে নাকি এমন এক যন্ত্র বানাতে পারে যার সাহায্যে মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য জানা যাবে। যাকেই সে দেখে তাঁকেই তাঁর নতুন থিওরির কথা বলতে থাকে। কিন্তু তার আগমনের খবর পাওয়া মাত্র লোকে না দেখার বা না শোনার ভান করে চলে যেত।

একদিন সুব্রত বসে আছে বাড়ির রকে, এমন সময় একটা প্রাইভেট কার এসে থামল তার সামনে। ভেতর থেকে ভদ্রলোক তাকে একটা ঠিকানা খুঁজে দিতে বল্লেন। সুব্রত যে উত্তর দিলেন ভদ্রলোকের তা মনঃপুত হলো না, ভদ্রলোক তাকে গাড়িতে উঠে এসে বাড়িটা দেখিয়ে দিতে বল্লেন। সুব্রত ভাবলে তাঁর থিওরি শোনানোর একজন লোক হয়তো পাওয়া গেল, তাই দেখিয়ে দিতে এক কথাতেই রাজি হয়ে গেল।

সুব্রত জিজ্ঞাসা করল ভদ্রলোক কোথা থেকে আসছেন। তিনি বললেন ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদ থেকে। কথাটা শুনে সুব্রত যেন হাতে স্বর্গ পেল। সে তার থিওরি বলতে আরম্ভ করল। "জানেন স্যার আমি একটা যন্ত্র বানাতে পারি যার সাহায্যে মানুষের চরিত্র জানা যায়।" ভদ্রলোক যে ভাবে মনযোগ দিয়ে শুনছিলেন সুব্রতর তাতে উৎসাহ বেড়ে গেল। সে আবার আরম্ভ করল। যন্ত্রটি একটি স্বয়ংক্রীয় কম্পিউটর, যা থেকে কতকগুলো অদৃশ্য মাইক্রোওয়েভ বেরবে। সেই ওয়েভ মস্তিষ্কে চতুর্দিকে এক আবরণের সৃষ্টি করবে, এবং পরিশেষে তা সেরিব্রামের ভাঁজে ভাঁজে পৌঁছাবে। মানুষের ছোটবেলা থেকে যে সমস্ত স্মৃতি জমা হয়ে থাকে তা মস্তিষ্কের ভাঁজে জমা থাকে। এই যন্ত্র সেই সমস্ত স্মৃতি নিয়ে আসবে সেই সঙ্গে বর্তমান বা প্রাচীন অভিসন্ধিও। যন্ত্রটির সঙ্গে একটি টেলিপ্রিন্টারও থাকবে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই ছাপা হয়ে যাবে। তাহলে বুঝতেই পারছেন স্যার এই যন্ত্র তৈরি হলে গোয়েন্দা বিভাগের কি অভাবনীয় সুবিধা হবে। ভদ্রলোকের দু চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। মনে ভাবেন এত সাধারণ ছেলে নয়।

ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদের সর্ব প্রকার সাহায্যে যন্ত্রটি তিরি ও পরীক্ষার কাজ একদিন সত্যিসত্যি শেষে হল। নাম দেওয়া হল সেরিব্রাল ক্যাচার, নামটি অবশ্য সুব্রতরই দেওয়া। ইতি মধ্যে যন্ত্রটির একটি মডেল ও কাজ কৌশল স্টকহোমে নোবেল পুরস্কার কমিটিতে পাঠানো হয়ে গেছে। সায়েন্স ওয়াল্ড পত্রিকায় প্রথম সেরিব্রাল ক্যাচারের দিকবিজয়ের

কাহিনী ঘোষনা করল। আর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ল। বিশ্বের পত্রিকায় এর খবর প্রতিফলিত হল, এই অভাবনীয় সাফল্যের সংবাদ।

রাষ্ট্র সংঘের প্রস্তাবে স্থির হল ষ্টকহোম থেকে একজন প্রতিনিধি পাঠানো হবে, সে সুব্রত সহ তাঁর যন্ত্রটি নিয়ে যাবে। সঙ্গে থাকবে সুরক্ষিত পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা। ভারত সরকার অনুমতি দিলেন, এয়ার ইণ্ডিয়ার বিশেষ বিমানে তাদের যাত্রার ব্যবস্থা করা হল। যাত্রার আগের দিন কাগজ পত্র সব গুছিয়ে নিয়ে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। প্লেন উড়ে চলেছে এমন সময় তিনি সুব্রতকে বল্লেন, "আমি ভাল বাংলা বলতে পারি না দয়া করে বুঝে নেবেন। স্যার আমাদের পৌঁছাতে দিন খানেকের মত সময় লাগবে, এতক্ষণ চুপচাপ থাকতে একঘেয়ে লাগবে না?" "তা লাগবে বৈকি," সুব্রত উত্তর করল। "তাহলে আসুন না স্যার আপনার যন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে আমরা একে অন্যের চরিত্র জানি। সুব্রত তার যন্ত্রটির নব ঘোরালো, টেলিপ্রিণ্টার ছাপতে লাগল "মিঃ জোন্স, শান্ত এবং ধীর...কমিটির যোগ্য সদস্য।" এবারে আপনার পালা স্যার। নবটা আরেকটু ঘোরাতে লাগল এবং আবার টেলিপ্রিণ্টার ছাপতে লাগল, "বিজ্ঞানে যথেষ্ট পারদর্শী...।" তাহলে বুঝুন স্যার আপনি কতবড় বিজ্ঞানী আর আপনাকে পাগল আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছিল। এবারে সুব্রত না হেসে পারল না। আমার সম্বন্ধে বোধহয় একটু বাড়িয়ে বলছেন। আসলে কি জানেন আমাদের বোধ শক্তি এতক্ষণ যে আমরা অন্যের জাগ্রত প্রতিভাকেও বুঝতে পারি না। পঙ্কে জন্ম গ্রহণ করলেও পদ্ম হয়ে ফোটা যায় এ বিষয়ে আমরা অজ্ঞ।

এবারে নবটা আরো মুড়িয়ে দেওয়া হল। কিন্তু টেলিপ্রিণ্টারে একি ছাপা হচ্ছে? পেছনের সাত-আটজন লোক সকলেই হাইড্যাকার, যে কোন মুহূর্তে লুঠ করতে পারে। সর্বনাশ তাহলে কি হবে? মিঃ জোন্স বল্লেন। অপনার পাশের এমারজেন্সি সুইজটা অন করুন।

হাত আর সুইজ পর্যন্ত এগোয় না, তার আগেই একটা নল এসে তার পিঠে ঠেকে, হাত বাড়াবেন না, শান্ত হয়ে থাকলে আমরা আপনার কোন ক্ষতি করব না। পেছনে ফিরে সুব্রত দেখল প্রহরীদের সকলকে বন্দী করা হয়েছে। বিমান ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করা হল না। ডান দিকে ঘুরিয়ে লিবিয়ার মরুভূমিতে নামানো হল। একটা গাড়ি আগেই দাঁড়িয়ে ছল, প্লেন থেকে সুব্রত ও তাঁর যন্ত্রকে দুজন লোক মিলে জোর করে গাড়িতে ঢোকাল। ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়িতে ষ্টার্ট দিয়ে দিল। ওদিকে আচমকা আক্রমণ করে বিমানে অবশিষ্ট ছয়জনকে ধরে ফেল্ল। তারপর বিমানের কণ্ট্রোল রুম থেকে লিবিয়ার ভারতীয় দূতাবাসে খবর পাঠিয়ে দিল। পরক্ষণেই পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে এই ভয়ঙ্কর সংবাদ পৌঁছে গেল।

গাড়িটা খুব জোরেই চলছিল। দুজন হাইজ্যাকার সশস্ত্র প্রহরায় রেখেছিল তাঁকে। হঠাৎ সুব্রত অজ্ঞান হবার ভান করে, পিছনের সিট থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে পরল। তারপর সামনে সিটের নীচে নিয়ে হাত বাড়িয়ে সামনের সিটে রাখা যন্ত্রটিকে আঁকড়ে ধরে নবটি টিপে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে একটা জোরালো রশ্মি ড্রাইভারের চোখে পড়তে লাগল। এদিকে পেছনের সিটের দুজন সুব্রতকে এভাবে পড়ে যেতে দেখে মাথা নীচের দিকে ঝুঁকিয়ে দেখতে গেল কিছু হয়েছে নাকি। ঠিক তখনই সুব্রত মাথাটা সজোরে পিছনের দিকে আনলেন, ফলে যা হবার তাই হল সুব্রত মাথার ধাক্কায় দুজনেই গাড়ির দেওয়ালে আছড়ে পড়লেন। হাতের বন্দুক ছিটকে গেল, তারপর দুজনের মাথা সজোরে ঠুকে দিলেন।

জোরালো আলোয় ড্রাইভারের চোখ ঝলসে যাওয়ার মত হয়ে গেছিল, চোখে হাত দিয়ে সে আলো রুখতে পারছিলেন না। সুব্রতর সামনের সিটে চলে এসে ড্রাইভারকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে ষ্টিয়ারিং ধরল, গাড়ি ড্রাইভিং করতে জানতেন না, এদিকে ড্রাইভার অন্ধ মানুষের মত যেদিকে সেদিকে হাত পা চালাছিলেন, দু একটা আঘাত যে তাঁর লাগেনি তাও নয়, গাড়িটা জনমানবহীন মরুভূমি ছেড়ে লোকালয়ে এসে পড়েছিল, সামনেই উঁচু দেওয়াল, সজোরে ব্রেক কষল সুব্রত, অত স্পীডে চলন্ত গাড়ি ব্রেক চাপার ফলে গাড়িটা দুবার পাক খেয়ে মাটিতে আছড়ে পরল, গাড়ি আগুন ধরে গেল। সেই সময় চতুর্দিক থেকে নিরাপত্তা বাহিনী এসে পড়ল।

ঠিক তখন সুব্রত বল্ল, "আমার ডিফেন্স মাষ্টার গেছে কিন্তু সেরিব্রাল ক্যাচার এখনও আছে।" সকলে বল্লেন কি ভাবে? সুব্রত বল্ল, "প্লেনের থেকে যখন আমাকে গাড়িতে তোলা হয় তখন বাক্স বদল করে ডিফেন্স মাষ্টারকে নিয়ে আসি কিন্তু আসল যন্ত্র থেকে যায় মিঃ জোন্সের কাজে। তাই বিনা বাধায় আমার সেরিব্রাল ক্যাচার পৌঁছে গেছে ষ্টকহোমে। দুঃখের কথা আমার লিট্‌ল ডিফেন্স মাষ্টারকে রক্ষা করতে পারলাম না।"

33/০ বিপ্লবী বারীন ঘোষ সরণী
বি আর-এস-11, ব্লক-10, ফ্লাট-17, কলকাতা-57

নিজে কর

একটি মজার ভেল্কিবাজী

ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তী

এসো, আজ আমরা একটা মজার ভেল্কিবাজী শিখি। এই ভেল্কিবাজী দেখিয়ে তুমি তোমার বন্ধু বান্ধবদের তাক্ লাগিয়ে দিতে পারো। এটি একটি ভেল্কিবাজী হলেও এর ভিতরই লুকিয়ে আছে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ এবং তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। যাক্, এবার ভেল্কি বাজীটা শুরু করা যাক্।

প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র এর মধ্য

(i) একটি হাল্কা প্লাস্টিকের টুকরো
(ii) কয়েক টুকরো কর্পূর
(iii) একটি বড় জল ভর্তি গামলা
(iv) কয়েক টুকরো বড় কাগজ নাও

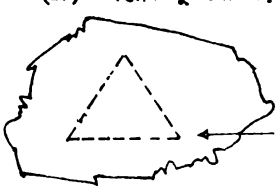

১নং চিত্র

প্রথমে হাল্কা প্লাস্টিকের টুকরোকে ছবির মতো করে (1নং) একটা ছোট সমবাহু ত্রিভূজের মতো করে কেটে নাও। প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য যেন 1·5 সেঃ মিঃ এর বেশী না হয়। এরপর ছবির মতো করে ত্রিভুজটির যেকোনও একটি বাহুর পেছনদিকে ছবির মতো করে (2নং চিত্র) একটা ছোট কোন কেটে নাও। এবার দু-এক টুকরো কর্পূর সেই কোণের মধ্যে চেপে লাগিয়ে দাও। এবার তুমি বন্ধুদের সামনে বড় জলভর্তি গামলাটি নিয়ে সেই জলে কর্পূর সমেত ত্রিভুজাকৃতি হাল্কা প্লাস্টিকের টুকরোটিকে ছেড়ে দাও। কি দেখবে জানো?

দেখবে সেই হালকা প্লাস্টিকের টুকরোটি দিব্যি ছুটোছুটি করে জলে চড়ে বেড়াচ্ছে। এই না দেখে সবাই অবাক হয়ে যাবে।

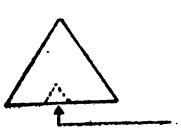

২নং চিত্র

এবার ধর যদি তোমার কোনও বন্ধু নিজে এই খেলা সকলের সামনে দেখিয়ে তোমাকে বোকা বানাতে চায় তখন তুমি কি করবে জানো?

তুমি সেই ত্রিভুজ সমেত কর্পূরটিকে বন্ধুর হাতে দিয়ে দেবে এবং সবার অলক্ষ্যে মাথায় আঙ্গুল ঘষে সেই আঙ্গুল জলে ছুইয়ে পরে তুলে নেবে। এরপর যখন তোমার বন্ধু সেই কর্পূর সমেত ত্রিভুজাকৃতির হাল্কা প্লাস্টিকটিকে জলে ছাড়বে তখন সেটি স্থির হয়ে থাকবে। ফলে তোমার বন্ধু বোকা বোনে যাবে।

এর পর হয়তো সে তোমাকে আবার সেটিকে সচল করতে বলতে পারে। তখন তুমি করবে কি, একটুকরো বড় কাগজ নিয়ে আলতো করো সমস্ত জল তলের উপরি তলের উপর বুলিয়ে নিয়ে সেই কর্পূর সমেত ত্রিভুজটিকে গামলার জলে ছেড়ে দাও দেখবে সেটি আবার সচল হয়ে গেছে।

২নং চিত্র

কি করে হলো? এবার সেটা ভেঙ্গেই বলি।

আমরা জানি যে কর্পূর খুব উদ্বায়ী পদার্থ। অর্থাৎ এটি সহজেই বায়ুতে উবে যায়। এখন এই ত্রিভুজাকৃতি প্লাস্টিকের টুকরোয় কর্পূর দেওয়া আছে। বায়ুর সংস্পর্শে থাকার দরুণ এটি দ্রুত উবে যেতে অর্থাৎ বায়ুতে মিশ্রিত হতে থাকবে। এর ফলে একটি গতির সৃষ্টি হবে এবং এই গতির অভিমুখ ত্রিভুজের গতির বিপরীত দিকে হবে। নিউটনের তৃতীয় গতি সূত্রানুযায়ী সম পরিমাণ গতি ত্রিভুজেও সঞ্চারিত হবে। ফলে সেটি সচল হবে।

এবার যখন তুমি মাথায় আঙ্গুল দিয়ে ঘষলে তখন মাথার তেল তোমার আঙ্গুলে আসবে আর সেটা তোমার অঙ্গুলের মাধ্যমে গামলার জলে যাবে। যেহেতু জল তেল মেশে না বলে সেই তেল জলে ভেসে থাকবে আর সেটাই এই ত্রিভুজের গতি বন্ধ করে দেবে। এরপর যখন তুমি কাগজের টুকরো দিয়ে জলের উপরিতলে বুলিয়ে নেবে তখন সেই তেল তোমার কাগজে চলে আসে এবং জলে আর তেল থাকে না। ফলে ত্রিভুজটি আবার সচল হয়।

সত্যি, কি মজার ভেল্কিবাজী। তাই না?

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—কর্পূর সমেত ত্রিভুজাকৃতি হালকা প্লাস্টিকটি যেন কখনও জলে না ডোবানো হয়। জলের-উপরিতলে ছাড়তে হবে।

AF বুক নং 237, সল্টলেক, কলিকাতা-64

ভ্রমণ ও অভিযান

ধীরেন্দ্রলাল ধর ॥ দুরন্ত যাত্রী
২য় সংস্করণ, ১৯৮১ পৃঃ ৯৯ দাম ৮.০০

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ॥ গঙ্গা যমুনা
১ম সংস্করণ, ১৯৮২ পৃঃ ৭২ দাম ৮.০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সুন্দরবনে সাত বৎসর
৩য় সংস্করণ, ১৯৭৯ পৃঃ ১১২ দাম ৮.০০

দক্ষিণারঞ্জন বসু ॥ হঠ যাও হার্মাদ
১ম সংস্করণ, ১৯৭৯ পৃঃ ৭২ দাম ৮.০০

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ॥ আমাজনের অরণ্যে
২য় সংস্করণ, ১৯৮৩ পৃঃ ৯৬ দাম ৮.০০

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ নীল তিমি
২য় সংস্করণ, ১৯৮৩ পৃঃ ৯৬ দাম ৮.০০

শিশির ঘোষ ॥ লাহুলসিংহের সন্ধানে
১ম সংস্করণ, ১৯৭৫ পৃঃ ৮২ দাম ৬.০০

সুনির্মল বসু ॥ রোমাঞ্চের দেশে
নতুন মুদ্রণ, ১৯৮৩ পৃঃ ৫৬ দাম ৬.০০

রহস্য, রোমাঞ্চ, ভৌতিক গল্প

হেমেন্দ্র কুমার রায় ॥ ভৌতিক গল্প
নতুন সংস্করণ, ১৯৮২ পৃঃ ১৩৫ দাম ১০.০০

আনন্দ বাগচী ॥ মুখোশের মুখ
১ম সংস্করণ, ১৯৮২ পৃঃ ১১৫ দাম ৮.০০

হেমেন্দ্রকুমার রায় ॥ মোহনপুরের শ্মশান
নতুন সংস্করণ, ১৯৮২ পৃঃ ৫৪ দাম ৫.০০

দীনেন্দ্রকুমার রায় ॥ যখের আসন
২য় সংস্করণ, ১৯৮৩ পৃঃ ১১২ দাম ৮.০০

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল ॥ কিশোর রহস্য গল্প
১ম সংস্করণ, ১৯৮২ পৃঃ ১১৬ দাম ৮.০০

হেমেন্দ্রকুমার রায় ॥ যক্ষপতির রত্নপুরী
নতুন সংস্করণ, ১৯৮২ পৃঃ ৯২ দাম ৬.০০

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল ॥ কিশোর রোমাঞ্চ গল্প
১ম সংস্করণ, ১৯৮২ পৃঃ ১১২ দাম ৮.০০

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল ॥ কিশোর গোয়েন্দা গল্প
২য় সংস্করণ, ১৯৮৩ পৃঃ ১১৬ দাম ১০.০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

R No. 37390/81 KISHORE JAN-BIJNAN 3rd year, April 1984 Regd NO. WB/EC 255

ছোটদের বই

সচিত্র জ্ঞানবিজ্ঞান

অমরনাথ রায়

সংখ্যা নিয়ে খেলা ৮.০০

জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজার খেলা ৫.০০

সায়েন্স ক্যুইজ ১০.০০

সমরজিৎ কর

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ১৫.০০

সমুদ্রের সম্পদ ৮.০০

অরূপরতন ভট্টাচার্য

রোবোট এল কেমন করে ৬.০০

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার ৬.০০

সিদ্ধার্থ ঘোষ

স্যাম লয়েড ও লুইস ক্যারোলের ধাঁধা ১০.০০

ফ্যান্টাসী ও মজার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র

মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা ৮.৩০

ঘনাদার জুড়ি নেই ৮.০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

চারমূর্তি ৮.৩০

ঝাউবাংলোর রহস্য ৬.৫০

কম্বল নিরুদ্দেশ ৬.৫০

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

গুপী গাইন বাঘা বাইন ৫.০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

হাতিচোর ৮.০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প ৮.৫০

বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞানের গল্প

লীলা মজুমদার

কল্প-বিজ্ঞানের গল্প ১৫.০০

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

লুপ্তধন ৮.০০

তুষারলোকের রহস্য ৮.০০

মেঘনাদ ১০.০০

অদ্রীশ বর্ধন

কিশোর সায়েন্স ফিকশ্যান ১৫.০০

শৈব্যা প্রকাশন
৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা ৭৩

কিশোর ক্ল্যাসিকস

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
রাজকাহিনী, বুড়ো আংলা
ও হানাবাড়ির কারখানা
তিনটি বই একমলাটে

তেপান্তর ১৫

প্রেমেন্দ্র মিত্রর
ঘনাদার সুবর্ণজয়ন্তী
উপলক্ষ্যে প্রকাশিত খনার
বচন, গল্প নাটক ও
উপন্যাসের বিচিত্র সমাহার

ঘনাদা বিচিত্রা ১২

বিভূতিভূষণ বন্দ্যো-র
অপুর ছেলেবেলা, ছোটদের
অপরাজিত ও তারাদাস
বন্দ্যোর কাজল— ৩টি বই
একসঙ্গে ১৫

কিশোর অপু

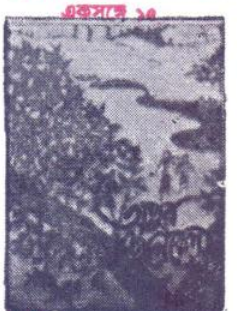

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ হইতে প্রকাশিত
এবং ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা ৬, তাপসী প্রিণ্টার্স হইতে মুদ্রিত। দাম দুইটাকা পঞ্চাশ পয়সা।
প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ লক্ষীনারায়ণ প্রসেস ৯৯ গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলি-৬